সোণার-তরী সিরিজ

কে হত্যাকারী ?

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী
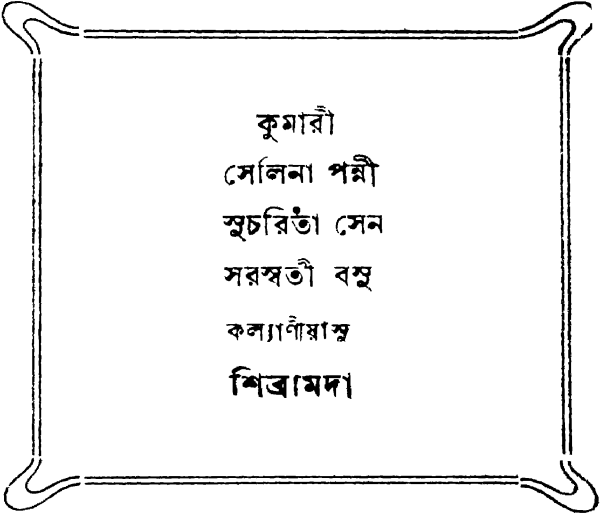
প্রাপ্তিস্থান—
বিশ্বনাথ পাব্লিশিং হাউস্
৮নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কুমারী

সেলিনা পন্নী

সুচরিতা সেন

সরস্বতী বসু

কল্যাণীয়াসু

শিব্রামদা

সূচী

ভূমিকা বনাম এজাহার

এটা বইয়ের ভূমিকা নয়, আমার এজাহার। বইটার সঙ্গে একটা হত্যাকাণ্ড জড়ানো। আর প্রত্যেক হত্যাকাণ্ডেই, আসামীকে, এমন কি, আসামী না হয়েও অনেককে এজাহার দিতে হয়। হত্যা ব্যাপারের এই এক দোষ, এবং এই দস্তুর। এবং এই হাঙ্গামার জন্যেই, অনেকের মনে হত্যাকাণ্ডের সাধ থাকলেও সহসা হাত উঠতে চায় না।

কে হত্যাকারী ?—এই বইটির হত্যাকারী যে কে তা খুঁজে বের করতে দস্তুরমত তোমাদের বেগ পেতে হবে। যাকে এবং যাকে যাকে হত্যাকারী বলে সন্দেহ করবে অবশেষে দেখা যাবে যে সে নয়। যে লোকটি খুন্ হয়েছে আর যে গোয়েন্দা এই দুজন ছাড়া প্রায় সবার প্রতিই তোমাদের সন্দেহ হবে—এবং লেখকহিসেবে সেইখেনেই তো আমার বাহাদুরি। এমনকি, এক এক সময়ে গোয়েন্দার প্রতি সন্দেহ জাগাও কিছু বিচিত্র নয়—বাহাদুরির ওপরে সেটা আরো এক কাঠি। এমনকি, শেষে যদি এমন মনে হয় যে খুন্-হওয়া লোকটাই নিজেকে খুন করেছিল (অথচ সেটা তার আত্মহত্যা নয়) তাহলেও আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হব না।

ডিটেক্টিভ বইয়ে আশ্চয্য হবার কিছু নেই—যদিও আশ্চর্য্যের বিষয় পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে ছড়ানো থাকে। অবশ্যি, শেষ পর্য্যন্ত কী তোমরা দেখবে, (একজন হত্যাকারীর দেখা পাওয়াও মোটেই বিস্ময়কর নয়), সেটা তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর ওপরে নির্ভর করে—আমার পক্ষে তা বলা সাজে না। তবে একটা কথা আমি বল্তে পারি, এবং বল্তে চাই, যে যাকে তোমরা কিছুতেই সন্দেহ করবে না, করতেই পারবে না—আসলে সেই হচ্ছে এই বইয়ের হত্যাকারী। সে হচ্ছে আমি। আমিই এই বইটিকে হত্যা করেছি, এবং এই জন্যেই আমার এই এজাহার।

ডিটেক্‌টিভ গল্প আমি লিখি না। লেখেন আমাদের হেমেনদা—তোমাদের সবচেয়েপ্রিয় হেমেন্দ্র কুমার রায়। আমার হচ্ছে যত হাস্যকর প্রয়াস। তবু কেন যে আমি তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই দুঃসাহসিক অপকর্ম্মে লিপ্ত হয়েছি তার গোড়ায় একটু ইতিহাস আছে! আমার এজাহারের মধ্যে সেই কাহিনী লিপিবদ্ধ হোলো।

খ্যাতির জন্যে মানুষ কী না করে? খ্যাতির খাতির একদম আলাদা। এমন কি, লেখকরাও চায় তাদের খ্যাতির চৌহদ্দি বাড়ুক। যিনি কবিতা লেখেন তিনি হঠাৎ উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেন, আর উপন্যাসকার তাঁর চার পোয়া কীর্ত্তি উপচে উঠে কবিতায় হাত পাকাতে লেগে যান—নিদেন পক্ষে গদ্য কবিতায়। এমনই হয়ে থাকে। অতএব আমি কিছু তার ব্যতিক্রম হতে পারি না।

তবে, আমার যে খ্যাতি আছে, বা কদাচ হতে পারে, এ সন্দেহ আমার কখনো ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি সে ধারণা আমার টলেছে। এ কজনের পত্রাঘাতেই আমার সেই ধারণা টলিয়ে দিয়েছে।

যে যুগে ডাকঘর ছিল না, ভাবো একবার, লেখকদের কী কষ্টটাই না গেছে! নিজেদের খ্যাতির বহর টের পাবার কোনো উপায়ই তখন ছিল না। দূর দূরান্তরের পাঠক পাঠিকার কাছ থেকে চিঠি পত্রের তুলনায় নির্জ্জলা সাধুবাদ না এলে লেখবার কি সাধ হয়? লেখার আস্বাদই চলে যায়। তোমরাই বলো না! অথচ, ভবভূতির কথাই ধরো, কিম্বা কালিদাসকেই ধরা যাক্‌। তাঁদের দুঃখের কথা ভাবলে আমাদের দুঃখ হবে। চিঠি পেতেন না, কিছু না, তবু কোন্‌ সুখে যে তাঁরা লিখতেন, তাঁরাই জানেন!

বাস্তবিক, তাঁদের কোন্‌ বইটা পাঠকসমাজ ঠিক কি ভাবে নিল জানবার তখন কোনো উপায়ই ছিল না। কেন না, তখন ডাকঘর ছিল না, তাই পাঠকদেরও জানাবার কোনো উপায় ছিল না। সত্যি বল্‌তে, কোন্‌ লেখক তাঁর পাঠকদের কাছ থেকে কতগুলি করে' চিঠি পেয়ে থাকেন তাই-তো তাঁর সাফল্যের নিরিখ। কেবল সম্মান-দণ্ডই না, একমাত্র মানদণ্ডও তাই।

অবশ্যি, ভবভূতির বাল্যকালের চতুষ্পাঠীর প্রাক্তন সতীর্থ কয়েক-

জন ছিলই যারা পরমান্ন খেতে পেলে তাঁর লেখার বাহবা দিতে কার্পণ্য করত না, পায়স পিষ্টকের বিনিময়ে চিরদিনই তারা তাঁকে উৎসাহ দিয়ে এসেছে। এবং হয়ত কালিদাসের ভাগ্যও একেবারে মরুভূমি ছিল না। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠীরা, এমন কি স্বয়ং নগরপালও হয়তো, কোনো না কোনো দিন তাঁর পিঠ চাপড়ে বলে থাকবেন, "লেগে থাকো ছোকরা, চর্চ্চা ছেড়োনা। ভালো হোক্ মন্দ হোক্, লেখার অভ্যাস রেখে যাও। কালেক্কে একদিন তুমিও নামজাদা হবে। কিছু আশ্চর্য্য নয়।"

এমন উৎসাহ লাভ তো আমাদের বরাতেও ঘটে থাকে। আমাদেব এলাকাব দারোগা, অতোদূর না হোক, একজন ডাক পিয়ন সেদিন আমার একখানি বইয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছে। দুঃখের বিষয় বইখানি আমার লেখা নয়। কার লেখা তাও জানিনে। এবং চপ কাটলেট খাওয়ালে, আমাদের বন্ধুরাই বা কোন্ আমাদের লেখাকে মন্দ বলবে? তা মনে মনে যতই শত্রু হোক্, কিন্তু সেকথাতো নয়। কাছাকাছির প্রশংসামাত্রেই স্বার্থপ্রণোদিত কিম্বা অর্থহীন। একেবারে অর্থহীন হয়তো নয়, বরং বেশ পরচাস্তকর, তবে কিনা, তার কোনো মানে হয় না। অজানার, অচেনার এবং সুদূরের সার্টিফিকেটেরই যা কিছু দাম। রবীন্দ্রনাথ কি সাধে বলেছিলেন, 'আমি সুদূরের পিয়াসী!'

এই সুবিধা সেকালের কালিদাস-ভবভূতির ছিল না, আমাদের আছে: ডাকঘর-কল্পতরুর প্রসাদে নব নব পত্রোদ্গমের এই সুবিধা। এই চিঠি পাওয়া পাওয়ি নিয়ে লেখকদের মধ্যে কি কম রেষারেষি! কোনো সাহিত্যিক বৈঠকে দুজন লেখকের মধ্যে প্রথম আলাপ হয়তো এই ভাবেই হয়ে থাকে :—

"ওঃ, কী চিঠিই আসছে আজকাল! পাঠক পাঠিকাদের প্রশংসার জ্বালায় তো গেলাম ভাই! কখন্ যে অতো অতো চিঠির জবাব দেব ভেবে পাইনে, আমার নাবার খাবার সময়টুকুও নেই। কি করি বলো তো? আমার হয়ে গুছিয়ে জবাবগুলো দিয়ে দিতে পারে এমন একজন কাজের লোক দিতে পারো আমায়? এই সেক্রেটারী গোছের?"

"দুঃখের কথা আর বোলোনা ভায়া!" দ্বিতীয় জন জবাব দিয়েছেন, "দুজন সেক্রেটারী ছিল আমার—কেবল এই কর্ম্মের জন্তেই। কিন্তু বস্তা বস্তা চিঠি এলে তাদের অবস্থা কেমন হয়, বারেক ভেবে গ্যাখো! তাদের আর কি দোষ দেব? আমার কপালের দোষ! আজ সকালে তারা দুজনেই ভেঙে পড়েছে—"

"ভেগে পড়েছে? কি বল্লে? চিঠির ভয়ে পালিয়ে গেছে নাকি?"

"না না, পালাবে কোথায়? চিঠির ভয়ে নয়—চিঠির ভারে কোলাপ্স্ করেছে। সেই কথাই তো বল্‌ছি! দুজনেই তারা এখন হাসপাতালে, আইসব্যাগ মাথায় দিয়ে শয্যাশায়ী। চিঠিতো আক্‌চারই পাই. কিন্তু এত বেশি চিঠি কক্ষণো এর আগে পাইনি। কেন এমন পাচ্ছি বল্‌তে পারো?"

প্রথম জন প্রথমটা একটু ভড়কে গেলেও সাম্‌লে নিয়েছেন। এবং বেশ উষ্ণ হয়েই এবার তিনি বলেছেন: "বটে? গত সপ্তাহে তুমি কতোগুলি চিঠি পেয়েছিলে শুনি একবার?"

"তুমি কতগুলি?"

"আমি আগে জিজ্ঞেস করেছি।" প্রাথমিক লেখক বলেছেন—"আগে তার জবাব দাও।"

এবং তারপর, আর কোনো জবার নয়, পরস্পরকে তাঁরা জবাব দিয়েছেন—হয়ত জন্মের মত। যাঁরা লেখকদের উৎসাহিত করার অভিপ্রায়ে চিঠি দেন তাঁরা সম্ভবতঃ জানেন না যে ঐ চিঠি নিয়ে আড়াআড়ি করতে গিয়ে কতো সুহৃদের যে চিরদিনের জন্য ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়! ভগবান, তুমি এই চিঠিদাতাদের মার্জ্জনা কোরো, তারা জানে না তারা কি করে—চিঠি দিয়ে অজ্ঞাতসারে কোন্ সর্ব্বনাশ তারা করে তারা জানে না!

তবে আমিও কি কারো চিঠি পাইনে? পাই বই কি। কখনো যে পাইনি, তা বলা যায় না। অল্প বিস্তর পেয়ে থাকি—আমিও। সত্যি বল্‌লে বল্‌তে হয়, অল্পের দিকটা একেবারে অত্যল্প নয়, মানে শূন্য নয় একেবারে; আর বিস্তরের দিকেও তেমনি

খুব বেশি বিস্তার নেই। প্রায় মাঝামাঝি। আমার বই যারা পড়ে তারা নিতান্তই 'পাঠক—লেখার' তারা কোনো ধার ধারে না, এইরূপ আমার ধারণা। হয় তারা চিঠিপত্র লিখতে ভালোবাসে না, অধিক লেখা বাহুল্য মনে করে, কিম্বা লিখলে, পত্রলেখক না হয়ে একেবারেই পত্রিকার লেখক হতে চায়, নয়তো লেখার তেমন কোনো সুযোগ তাদের নেই। প্রথমত:, মন খারাপ হলে লোকে আমার বই নিয়ে পড়ে, এই রকম শুনেছি। তখন কি চিঠি লিখতে মন যায়? তারপর, জেলখানার কয়েদীরা আমার বই পড়তে ভালোবাসে, কিন্তু তাদের চিঠিপত্র লেখবার সুযোগ কম। পকেটমাররাও নাকি আমার বই পড়ে বলে' শুনে থাকি। আমার লেখা পড়ে পড়ে তারা নাকি চৌকস্ হয়। নিত্যকর্ম্মে বেরুনোর আগে কাঁচির সঙ্গে শিব্রাম চকরবরতির একখানা বই নিয়ে তারা বেরয়। যেদিন এর অন্যথা করে সেদিন হয় তারা কারো পকেট ধরতে পারে না, নয় পুলিসের হাতে ধরা পড়ে। আবার এও শোনা গেছে, পাস্ করার ছেলেরা আমার বই পড়ার জন্যে ফেল্ করে ফেলেছে। তারপরে ফেল্ করার দুঃখ ভুলতে আবার তাদের আমার বই পড়তে হয়েছে। এবং তারপরে তার ফলে আবার—পুনঃ পুনঃ—যাকে ইংরেজিতে পাপচক্র না পাকচক্র কী বলে' থাকে! কিন্তু একথা আমার বিশ্বাস হয় না—একাধারে শক্তিশেল এবং বিশল্যকরণী এতদূর ক্ষমতা আমার বইয়ের আছে আমি বিশ্বাস করিনে। এমন কি, যেসব ছেলেমেয়েরা আমার বই পড়ে, আমার বই ছাড়া কিছুই পড়ে না, তারা কিছু না পড়েই পাস্ করতে পারে, এই জনশ্রুতিও একান্ত অলীক এবং অবিশ্বাস্য।

হ্যাঁ, চিঠি পাবার যেকথা বলছিলাম। আমিও চিঠি পেয়ে থাকি—নিতান্ত কম নয়। একের পিঠে অনেকগুলি শূন্য যোগ করলেই তার ইয়ত্তা হবে। শূন্যগুলি এখনো শূন্যই রয়ে গেছে এই যা দুঃখ, আপাতত আমি একখানাই পেয়েছি। এতদিনে সেই একখানাও যে আমার কোনো গুণমুগ্ধ পাঠিকার সে কথা বোধহয় হলফ করে বলা যায় না।

চিঠিখানি 'শিবরাম চক্রবর্ত্তী—কলকাতা' এইরূপ বিরাট ঠিকানা বহন করে এসেছিল। তবু যে এসে পৌঁছেছিল, এর মূলে আমার খ্যাতি কি ডাকঘরের কেরামতি কি আছে তা জানিনে। আমার মনে হয় এই কৃতিত্ব আমার অনুরাগী বন্ধু সেই ডাকপিয়নের—তারই কীর্ত্তি।

যাই হোক্, নাগা পাহাড় থেকে আসা সেই চিঠিখানি এইরূপ:

মাইডিয়ার চক্রবর্ত্তীবাবু,

মণিপুরের ইস্কুলে পড়তে একটী বাঙালী মেয়ের সঙ্গে আমার ভাব হয়েছিল। তার মুখে আপনার কথা শুনেছিলাম। আপনার ভাষায় নাকি ভারী অলঙ্কার সে বল্ত। আমরা নাগা মেয়েরা সাধারণত আমাদের জাতীয় গয়না গায়ে পরি—কিন্তু তা পরতে আমার ইচ্ছা হয় না। সেগুলো পরা ভারী কষ্টদায়ক। আমার বাবা তিনি এখানকার নাগাদের সর্দ্দার, বলেছেন আমার সেই বাঙালী বন্ধুর মত অলঙ্কার আমাকে কিনে দেবেন্। অতএব আপনি অনুগ্রহ করে' যত শীঘ্র পারেন আপনার সমস্ত অলঙ্কারের একখানা তালিকা পাঠিয়ে সুখী করবেন। অলঙ্কারগুলির দামও জানাবেন দয়া করে'। ক্যাটালগটা ভি পি করে' পাঠালে ভালো হয়। ইতি—

একান্ত ভাবে আপনার
কুমারী নিন্ ফ্যাচাঙ।

ঐ চিঠি পাবার পর অনেকদিন আমার ঘুম হয়নি। ওর কী জবাব হতে পারে, কী জবাব দেব, আমি ভেবে পাইনি। এখন অবধি আমাকে, বাধ্য হয়েই, নিরুত্তর থাকতে হয়েছে। সত্যি বল্তে, এমন চিঠি, কোনো কুমারীর হলেও, পেয়ে কী লাভ?

ভাষাগত আমার যাবতীয় অলঙ্কার, (যদি সত্যিই কিছু থাকে,) তালিকাবদ্ধ করে' পাঠাতে হলে আমার পুরো এক সেট বই পাঠাতে হয়। বই থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে আঠা দিয়ে সেঁটে তাদের গায়ে লাগানো যাবে না যে তা নয়, কিন্তু তেমন অলঙ্কার নাগাদের মুল্লুকেও কেমন জনপ্রিয় হবে আমার জানা নেই। দুনিয়ায় হালচাল্ সেই সঙ্গে ফ্যাশানও, আজকাল এমন উড়ুক্কু বোমার বেগে বদ্লাচ্ছে যে তাল রাখা মুস্কিল।

তারপর এই সেদিনের কথা বলি। আমি যে কতদূর বিখ্যাত লেখক এর থেকে তার পরিচয় পেলাম। তোমরাও সেটা পাও—সেই জন্মেই আমার বলা।

কফি হাউসে সেদিন একলা এক টেবিলে বসে আপন মনে কফি পান করছি, এমন সময়ে একটি অচেনা মেয়ে আমার সামনের কোচে এসে বসল। সদ্য কলেজেওঠা কোনো মেয়ে। আমার অচেনা হলেও আমি তার বেশ চেনা তার হাবভাব থেকে এইরকম বোধ হোলো।

"কী ভাগ্যি আমার! আপনার এখানে দর্শন পাব এ রকম আশা করিনি" বল্ল সে।

এর উত্তরে 'আমারো কী ভাগ্যি!' এই জাতীয় কোনো কথা বলাই বোধ হয় উচিত ছিল, কিন্তু বলব কি, সহসা ঐ ভাবে আক্রান্ত হয়ে অপ্রত্যাশিত ধাক্কায় কিছুক্ষণ আমার মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরুল না।

"তা বটে।" বল্লাম আমি অবশেষে।

"আজ আমার জীবনের কী শুভ লগ্ন! আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে তা বলতে পারি না। এক মুখে তা বলা যায় না। আপনার প্রত্যেকটি লেখা আমি মন দিয়ে পড়ে থাকি।—তা জানেন?"

"জেনে খুব খুশি হলাম। তবে একটা কথা জিজ্ঞেস করি যদি কিছু না মনে করো। তুমি কি পরীক্ষায় ফেল করেছ নাকি?"

"কক্ষনো না। আমি কেন, আমাদের বাড়ীর কেউ কখনো কোনো পরীক্ষায় ফেল হয়নি। আমি না, আমার দিদি নয়, আমার দাদারা না—ভাইরাও নয়। আমার দিদি আপনার বই পড়তে কী ভালোই যে বাসেন!'

"খুব মনোকষ্ট বুঝি তোমার দিদির? সব সময়েই মন খারাপ হয়ে থাকে—তাই বুঝি?"

"তা কেন? খুব স্ফূর্তিবাজ মেয়েই তো! আমার দাদাও আপনার লেখার ভারী ভক্ত। তিনি আলীপুরে থাকেন।"

"ও! জেলখানায়! বুঝেছি।"

"না, জেলে কেন? সেখানকার এক সরকারী আপিসে তিনি কাজ করেন কিনা।"

"বটে? ভারী আশ্চর্য্য তো!" আমার নিজেরই আশ্চর্য্য লাগে এবার।

"আপনার বই পড়তে বসলে আমাদের আহার নিদ্রা ঘুচে যায়, নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। আর এমন রোমাঞ্চ হতে থাকে যে কী বল্‌ব! আপনার মত ডিটেক্‌টিভ বই আর কেউ লিখতে পারে না—"

"কিন্তু আমি তো ডিটেক্‌টিভ বই লিখিনে—" বাধা দিয়ে বল্‌তে গেলাম। কিন্তু কে শোনে? আমার বাধা অগ্রাহ্য করে মেয়েটি বলেই চলে— "উঃ, আজ কী মজাই না হবে. বাড়ী ফিরে মাকে, দিদিকে আর আমার ভাইদের বল্‌ব যে কফি হাউসে কার সঙ্গে আজ এক টেবিলে বসে খেয়েছি জানিস্? শুনলে তাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠবে। বল্‌ব যে, আর কেউ না, খোদ্ আমাদের শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।"

কে হত্যাকারী ?

প্রথম কিস্তি

রহস্যময় খুন

দৈনিক বিশ্ববার্ত্তার মফস্বল-সংস্করণ তখন ছাপা হচ্ছিল। বিরাট মুদ্রাযন্ত্রের গহ্বর থেকে প্রতি মিনিটে পাঁচ হাজার করে' কপি উদ্গীরিত হচ্ছে। কোন্ আশ্চর্য্য-কৌশলে অতগুলি করে' কপি আপনা থেকেই এপিঠে ওপিঠে ছাপা হয়ে, ভাঁজ হয়ে থাকে থাকে সজ্জিত হয়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে বেরিয়ে আসছিল বাহাদুররাই তা বল্‌তে পারেন।

প্রায় তিন মাইল পরিমাণ কাগজে প্রাত্যহিক বিশ্ববার্ত্তা ছাপা হয়। কাগজগুলি পাশাপাশি ছড়িয়ে রাখলে তিন মাইল পরিমিত জায়গা জুড়ে বসবে। কিন্তু আসলে, ঐ তিন মাইল কাগজ তিন মাইলের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সারা ভারতবর্ষে (কতো হাজার মাইল কে জানে!) ছড়িয়ে যায়। প্রত্যেকেই আমরা প্রাতঃকালীন চায়ের সঙ্গে বিশ্ববার্ত্তা পড়ি; নতুবা চায়ের আস্বাদ পাই না।

বিশ্ববার্ত্তার বাড়ীটিও একটা যা তা নয়। ঠিক তিন মাইল ব্যাপী না হলেও, তিনতলা জুড়ে বড়ো বড়ো ত্রিশখানি ঘরে বিস্তারিত। কলকাতার কোনো এক নামজাদা রাজপথের ওপরেই এর কার্য্যালয়। এবং বলা বাহুল্য, বিশ্ববার্ত্তার দৌলতেই রাস্তার এই নামডাক।

তুমি যদি বিশ্ববার্ত্তার গহ্বরে কখনো প্রবেশলাভ করো তাহলে দেখবে সবাই সেখানে শশব্যস্ত। দেউড়ির দারোয়ান থেকে সুরু করে' ভেতরের কর্ম্মচারীরা, কম্পোজিটাররা, সংবাদদাতারা, বিজ্ঞাপনদাতারা—সকলেই সর্ব্বদা ইতস্ততঃ ধাবমান। সদরে অন্দরে সমান দৌড়-ঝাঁপ। এমন কি, কাগজ ছেপে বেরুতে না বেরুতে হকাররা বগলদাবা করে' নিয়ে দৌড় মারছে, তাও তুমি দেখতে পাবে। নিদারুণ কেনবার ইচ্ছা হলেও, তাদের কাউকে দাঁড় করিয়ে এক কপি কিনতে পারবে কিনা সন্দেহ।

উঃ, এত লোক কাজ করে বিশ্ববার্ত্তায়! আর এতজন সেখানে যাতায়াত করে কাজে-অকাজে। ভাবলে আকুল হতে হয়। ধরো, তাদের সবাইকে যদি সারবন্দী দাঁড় করিয়ে দেয়া যায় (অবিশ্যি, এভাবে দাঁড়াতে তাঁরা সহজে রাজি হবেন না), তাহলে সেই লাইন খুব সম্ভব সুন্দরবন ঘুরে আসবে। দুই লাইনে খাড়া করলে তার ডবল জায়গা ঘেরাও হতে পারে। আর যদি শোভাযাত্রা করে' বার করা যায়, তাহলে ঢাকুরিয়া লেকের মাঝ বরাবর গিয়ে পৌঁছবে। এত-দ্বারা অধিকাংশ নাগরিককে জলাঞ্জলি দিতে হয় বলে'

কলকাতার পুলিশ কমিশনার এই শোভাযাত্রার সম্ভবতঃ অনুমতি দেবেন না। কিন্তু, তা না দিলেও, এতেই ব্যাপারটা কেমন ঘোরালো তা হৃদয়ঙ্গম হবে।

এই মুহূর্ত্তে এই বিরাট অট্টালিকায় কী দারুণ হৈ-চৈ! এই মুহূর্ত্ত বলেই নয়—এটা প্রতিমুহূর্ত্তের ব্যাপার। দিনেরাতে কখনো একটুক্ষণের জন্যও বিশ্ববার্ত্তা-কার্য্যালয় চুপ্‌চাপ্‌ রয়েছে একথা ভাবতে পারা যায় না। তবে ঘরে ঘরে কর্ম্ম-কোলাহল চল্লেও একটি ঘর নীরব, একদম্ ঠাণ্ডা। সেই ঘরটি বিশ্ববার্ত্তার বড়কর্ত্তার ঘর। যাঁর বুদ্ধিবলে এবং কর্ম্মফলে বিশ্ববার্ত্তা আজ বিশ্বের প্রায় সবচেয়ে বড় বার্ত্তা হয়ে দাঁড়িয়েচে—বিশ্ববার্ত্তার সমস্ত কিছু নির্ভর করছে যাঁর বিরাট স্কন্ধে সেই থরহরি দত্তর ঘরটিই কেবল চুপ্‌চাপ্‌।

সারা বাড়ীটিকে, বাড়ীর সবাইকে এবং সব কিছুকে কম্পমান করে' রাখলেও থরহরি নিজে নিষ্কম্প। শুধু নিষ্কম্প নন্, নিবাত-নিষ্কম্প। বাত তিনি খুব কমই বলেন, খুব কম লোকের সঙ্গেই বলেন। তাঁর মধ্যে কোনো ব্যস্ততা কোনো চাঞ্চল্য নেই। তাঁর বিরাট দেহ দেখলে মনে হয় সত্যিই তিনি বিরাটদেহ। এবং মুখভাব দেখলে মনে হয় তাঁর মাথার ভেতরে যে বিরাট মস্তিষ্ককে তিনি অকাতরে বহন করছেন তা চারটিখানি না। কাজেই, উন্নত লোকরাও যে তাঁর কাছে এসে সহজেই অবনত হয়ে পড়বে তার আর বিচিত্র কি? তবে তাঁর মুখভাব দেখে তাঁর মনের মধ্যে প্রবেশ করা কারো সাধ্য নয়।

বড়কর্ত্তা নিজের প্রকাণ্ড চেয়ারে বসেছিলেন। আর তাঁর

টেবিলের চারধারে কাগজপত্রের ছড়াছড়ি। তাঁর ঐ টেবিলের ওপর দিয়েই বিশ্বের সমস্ত বার্ত্তা বয়ে চলেছে—যেসব বার্ত্তা সম্পাদকদের দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রাকরদের দ্বারা মুদ্রিত, হকারদের দ্বারা হকৃত হয়ে বিশ্ববার্ত্তারূপে পুনশ্চ আবার প্রবাহিত হবে। কিন্তু চেয়ারের ঐ মানুষটিকে সরিয়ে নাও, দেখবে বিশ্ববার্ত্তা অচল ; এমন কি আমাদের বিশ্বও অচল বলে' তোমার ভ্রম হবে।

এই সময়ে আমাদের গল্পের যবনিকা উন্মোচিত হতে দেখা গেল (এর আগে এই যবনিকা উন্মোচনের কোনো অর্থ ছিল না)—দেখা গেল যে বড়কর্ত্তা কি একটা সংবাদ গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করছেন।

তারবার্ত্তা, বেতারবার্ত্তা কিম্বা টেলিফোন-বার্ত্তা নয়, এক টুকরো কাগজে হাতে লেখা একটা খবর। কিন্তু চোখ বুলোতেই চকিতের মধ্যে তিনি সংবাদের মর্ম্ম বুঝতে পেরেছেন বলে বোধ হোলো।

"কী সর্ব্বনাশ !" তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন।

এর চেয়ে বেশী কথা—তীব্রতর ভাষা থরহরির কণ্ঠ থেকে কেউ কখনো শোনেনি। এই নিরেট, আত্মনিষ্ঠ, স্বয়ংসৃষ্ট মানুষ এর অধিক বাক্যব্যয় খুব কদাচই করেচেন। এর চেয়ে বেশি লম্বা এবং বেশি শক্ত কথা তাঁর মুখ থেকে খসলে তাঁর ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদাহানি ঘট্‌ত।

"কী সর্ব্বনাশ !" তিনি পুনরুক্তি করলেন : "কৃত্তিবাস খুন হয়েছে ! নিজের বাড়ীতে ! কি আশ্চর্য্য, কাল রাত্রে যে

একসঙ্গে আমরা খেলাম! আমি তাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে এসেছি আমার মোটরে!"

"তুমি যেতে পারো।" সংবাদদাতাকে তিনি বল্লেন। তার পরে টেলিফোনটা হাতে নিয়ে (একটুও চিন্তা না করে' তিনি টেলিফোনের চোঙ্ হাতে নিতে পারতেন, এমন কি চিন্তা করতে করতেও টেলিফোন করার তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল)— চোঙ্টা হাতে নিয়ে, ঠাণ্ডা গলায়, কাটাকাটা কথায়—একটিও কথা বাজে বর্বাদ না করে' বল্তে সুরু করলেন:

"হ্যালো, অপারেটর! পুট্ মি থ্রু টু—টু টু ফোর্। হ্যালো! কে? তুই তুই চার? হ্যালো, তুই তুই চার? কান্তিকুমার মিত্রকে আমি চাই। কান্তিই কথা বলছো? ওঃ, কান্তি! আমি থরহরি। কাশীপুরে একটা খুন হয়েছে—এক বাগানবাড়ীতে। কৃত্তিবাস সেনের বাড়ী। কৃত্তিবাস নিজেই নিহত। তুমি সেখানে চলে যাও—চট করে' এক্ষুণি। এই খুনের রহস্য তোমাকে উন্মোচন করতে হবে। যত টাকা লাগে, ব্যয়ের কোনো কার্পণ্য কোরো না। বিশ্ববার্ত্তা তোমার পেছনে রয়েছে। গাড়ী ভাড়া আছে তো তোমার কাছে? বেশ। বেরিয়ে পড়ো তাহলে।"

রিসিভারের চোঙ্ যথাস্থানে রেখে তার পরমুহূর্ত্তে বড়কর্ত্তা ঘূর্ণী চেয়ারের আরেক ধারে ঝুঁকে পড়লেন (এই চল্লিশ ডিগ্রী আন্দাজ)—ঝুঁকে পড়ে' তারযোগে আরাকানের যেসব বার্ত্তা এসেছিল—নিজস্ব এবং পরস্মৈপদী সংবাদদাতাদের প্রেরিত সেই

সব সংবাদে মনোযোগ দিলেন। কৃত্তিবাসকে তিনি আর চিন্তায় স্থান দিলেন না।

তাঁর কাজ করার ধরণই এই। বোধ হয় সব বিরাট ব্যক্তিরই ধরণধারণ এই রকম।

দ্বিতীয় কিস্তি

খুনের কিনারায়

খুনের কিনারা করা তো ঢের পরের কথা, কিন্তু মৎলব তাই হলেও আগে তার কিনারায় গিয়ে পৌঁছনো দরকার। লাশের কাছে এবং আশে পাশে অপরাধীর নানান্ নিশানা সাধারণ দৃষ্টির আগোচরে ছড়ানো থাকে—সন্ধানী নজরের অপেক্ষায়। কান্তিকুমারের গোয়েন্দা-সুলভ সেই সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। কান্তি গোয়েন্দা নয়, কিন্তু অনেক গোয়েন্দার কান কাটে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই কান্তিকুমারকে একটা মোটরে উপবিষ্ট হয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে কাশীপুরের দিকে ছুটতে দেখা গেল। গ্রে ষ্ট্রীটের মোড় পেরুতে না পেরুতেই তার কানে এল, হকাররা হাঁকছে: "কাউন্সিলার খুন্! বিশ্ববার্ত্তা টেলিগ্রাম্ পড়ুন বাবু! আরেকজন কাউন্সিলার খুন!"

গাড়ী থামিয়ে ছুটো পয়সা ফেলে দিয়ে এক পাতার একখানা

টেলিগ্রাম কান্তিকুমার কিনেছে। গাড়ীতে বসেই দুর্ঘটনাটার ওপরে চোখ বুলিয়ে নিয়েছে একবার।

কৃত্তিবাস সেন নামজাদা একজন কাউন্সিলার। তার গঙ্গাতীরবর্ত্তী বাগান বাড়ীতে কে বা কাহারা তাঁকে খুন্ করে রেখে গেছে। যে সব লক্ষণ দেখা যায় তাতে খুন্ বলেই সন্দেহ হয়—এমন কি, লক্ষণগুলির প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা করে' খুঁটিয়ে দেখলেও খুন্ ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। কর্পোরেশনের এই হতভাগ্য কাউন্সিলার মৃত্যুকালে বেশভূষায় সুসজ্জিত ছিলেন—দেখলে বেশ ধারণা হয় মৃত্যুর জন্য তিনি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। একটু আগে যে তিনি বিলিয়ার্ড্ খেলেছেন এরূপ ধারণা করাও খুব কঠিন নয়। বিলিয়ার্ড ঘরে চিৎপাৎ অবস্থায় তাঁকে পাওয়া গেছে--তাঁর একটা পা বিলিয়ার্ড টেবলের এক পায়ায় ঠেকানো। একটা চটক্‌দার কাপড়ের টুক্‌রো, যদ্দূর মনে হয় তাঁরই নিজের রুমাল, তাঁর গলায় পাক্ দিয়ে জড়ানো—সেই রুমালের সঙ্গে আটকানো আবার বিলিয়ার্ডের কিউ। তাঁর সারা মুখে প্রশান্ত হাসি। অদ্ভুত এক প্রসন্নতা। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় শ্বাসরুদ্ধ হয়েই তাঁর অবসান ঘটেছে। তাঁর দেহে দুটি গুলির গর্ত্তও দেখা যায়, প্রত্যেক দিকে একটি করে'—দেহের ভেতর দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে' পিস্তলের গুলি বেরিয়ে গেছে মনে হয়। তার ওপরে আবার পিঠের শিড়দাঁড়া ভাঙা। তাঁর হাত দুটি স্বামী বিবেকানন্দের ষ্টাইলে বুকের ওপরে বিন্যস্ত। এক হাতের মুঠোয় এখন পর্য্যন্ত বিলিয়ার্ডের একটা বল্ ধরা। ঘরের মধ্যে

ধ্বস্তাধ্বস্তি মারামারির কোনো চিহ্ন নেই—যাবতীয় আসবাব পত্র যে যার যথাস্থানে—কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খলা ঘটে নি। কেবল পরিধেয় বস্ত্র থেকে চৌকো একটা ফালি অন্তর্হিত হয়েছে।

বিশ্ববার্তার সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই খুনের নানাদিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। পত্রিকা বল্‌ছেন, এই নিয়ে দুই সপ্তাহের মধ্যে তিনটি কাউন্সিলার মারা পড়লো। এই ভাবে কাউন্সিলার মারা পড়লে, এই জাতি, মানে এই কাউন্সিলার জাতি আর কতোদিন টেঁকসই হবে? অকারণ কোনোরূপ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা তাঁদের অভিপ্রায় নয়, কিন্তু তা না হলেও, তাঁদের মতে এই কাউন্সিলার-হানির আশু অবসান ঘটা উচিত। প্রত্যেক জিনিষেরই একটি সীমা আছে, যুক্তিসঙ্গত সীমা। এমন কি কাউন্সিলার-মড়কেরও। খামাখা কেন একজন কাউন্সিলার খুন হবে?

অবশ্যি, প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে কাউন্সিলারদের বেঁচে থাকারই বা কি দরকার? তাদের বেঁচে থেকে—বাঁচিয়ে রেখেই বা কি লাভ? কিন্তু এ প্রশ্নের কোনো মানে হয় না। তারা বেঁচে থাকে। বেঁচে বর্ত্তে থাক্‌তে দেখা যায় তাদের—অত্যন্ত স্বভাবতঃই! এমন কি, সব দিক বিবেচনা করে দেখলে দেখা যাবে, জনসাধারণের কাছে, সমাজের কাছে, কাউন্সিলারের দাবী এমন কিছু বেশি নয়। এমন কিছু বেশি তারা চায় না যেজন্য তাদের এ ভাবে অপসারণ করা আবশ্যক। কী চায় তারা? মাঝে মাঝে একটু তোয়াজ, কখনো ঘুষ, এবং সময়ে অসময়ে

ভোট্। ব্যস্, এর বেশি কিছু নয়। এর জন্যই কি তাকে ধরে ধরে খুন করতে হবে? এইভাবের কাউন্সিলার-খতমের দ্বারা কলকাতার যে লাভ হয় তা কি কর্পোরেশনের ক্ষতির তুলনায় ওজনে কিছু ভারী? সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।

ইত্যাকার চুলচেরা খতিয়ে বিশেষ সংস্করণ বিশ্ববার্তার সম্পাদক এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে এই ধারায় কাউন্সিলারের বিয়োগ চল্‌তে থাক্‌লে, আর এক জেনারেশনের (কিম্বা ডিজেনারেশনের) মধ্যে আর একজন কাউন্সিলারেরও আর অস্তিত্ব থাক্‌বে না। মিসিং লিঙ্কের মত এরাও লোপ পাবে। এই জীবদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে কি আমাদের সকলেরই সমবেতভাবে তৎপর হওয়া উচিত নয়—এই প্রশ্নে তাঁর সম্পাদকীয় বক্তব্যের তিনি উপসংহার করেছেন।

কান্তিকুমার মিত্র গোয়েন্দা নন, বলেছি আগেই। কান্তিকুমার রিপোর্টার। বিশ্ববার্ত্তার স্বকীয় বিশেষ সংবাদদাতাদের মধ্যে তিনি বিশেষত্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠদ্দশা সাঙ্গ করে' বিশ্ববার্ত্তার কার্য্যালয়ে তিনি চাকুরি নিয়েছেন—এই দু'মাস। কিন্তু দু'মাসের মধ্যেই তিনি উন্নতির চূড়া থেকে চূড়ান্তরে উঠেছেন। কাজ নেয়ার প্রথম সপ্তাহেই তিনি এক গুরুতর সমস্যাভেদ করেন: পাটের বাজার থেকে পাট লোপাট হওয়ার সমস্যা। দ্বিতীয় সপ্তাহে আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যে ভ্যাজালের কেলেঙ্কারী তিনি প্রকাশ করে' দেন। তৃতীয় সপ্তাহে এই সহরের কতিপয় গণ্যমান্য নাগরিকের কুকীর্ত্তি লোকচক্ষে তিনি অনাবৃত করেন। তারপর থেকে, জটিল কুটিল

যেখানে যা কিছু সমস্যামূলক হয়ে রহস্যভেদের অপেক্ষায় আছে সে সমস্তর ভার বিশ্ববার্ত্তার দপ্তর থেকে তাঁর ঘাড়েই চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব এই খুনের কিনারা করার হেতু বিশ্ববার্ত্তার বড় কর্ত্তা থরহরিবাবু যে কান্তিকুমারের স্কন্ধে নির্ভর করবেন তাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

কান্তিকুমার অচিরেই খুনের কিনারায় এসে পৌঁছলেন। গঙ্গার ওপরেই প্রকাণ্ড ইমারত—বড় রাস্তার ওপরেই। এ ধারে রাস্তা—ওধারে গঙ্গা। কান্তিকুমার দেখল, পুলিশ চারধার ঘেরাও করে ফেলেছে। সেই ঘেরাওয়ের এখানে ওখানে ইতস্ততঃ অলস কৌতূহলীর দল জোড়ে বিজোড়ে দু পাঁচ সাত জনে জড়ো হয়ে গুলতানি পাকাচ্ছে। চারধারেই পাহারোলা। তাদের মুখের চেহারায় যেন এই প্রশ্ন দেগে দেয়া—অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি ? কিরূপ যেন একটা হতভম্ব মুখভাব—যা কেবল পুলিসের মুখেই দেখা যায়। সাধারণ পাহারোলার মধ্যে পুলিস কর্ম্মচারীরও অভাব ছিল না। তাদের একজন বল্‌ছিলেন, "এই ব্যাপারের পেছনে নিশ্চয়ই একটা গভীর ষড়যন্ত্র আছে, কিন্তু তা যে কী, আমি আন্দাজ করতে পারছিনে।" অপর ব্যক্তির জবাব শোনা গেল, "আমিও ভাই তথৈবচ।"

তৃতীয় কিস্তি

পুলিসের আক্কেল গুড়ুম্।

থানার বড় দারোগা, তাঁর চেহারাখানাও বেশ বড়। লম্বা-চৌড়া রাজ-সংস্করণের চেহারায়—চোখে মুখে কোটাল-সুলভ কৌটিল্য। সাধারণতঃ বড় দারোগাদের মধ্যে যেমনটি দেখা যায়। এই লোকটিই কি সেই লোক যাঁর ঘোষণা আমরা যেখানে সেখানে যখন তখন দেখেছি—সহর আর সহরতলীর আনাচে-কানাচে যাঁর সজাগ দৃষ্টি সর্ব্বদা পাহারা দিচ্ছে? যে-সতর্ক দৃষ্টি ঠগী আর বদ্‌মাইসদের হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে দ্বিধা বোধ করছে না—আমরা মারা যাবার পরে? না, বোধ হয় তিনি নন।

বাড়ীর সাম্‌নের একটা সরকারী ল্যাম্প পোষ্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন দারোগা। কান্তিকুমারকে দেখে তিনি গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়লেন।

"কী? আক্কেল গুড়ুম্ নাকি, আত্মনাথ?" কান্তিকুমার জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, কান্তি। আবার আমার আক্কেল গুড়ুম্।" জবাব দিলেন বড় দারোগা ওরফে আত্মনাথ। তাঁর কণ্ঠস্বর সজল বলে' বোধ হোলো। "আমার ধারণা ছিল এটার আমি কিনারা করতে পারব, কিন্তু এবারও আমি কোনো কূল পাচ্ছি না।"

আদ্যনাথ রুমাল দিয়ে, কপালের ঘাম মুছবার ছলনায় চোখের কোণ দুটো মুছে নিল।

"এই নাও সিগ্রেট্।" বল্ল কান্তি : "এখন বলোতো ব্যাপার-খানা কি? শুনি আগাগোড়া। রহস্যটা কোথায় দুর্ভেদ্য হয়েছে দেখা যাক্।"

সিগ্রেট্ পেয়ে আদ্যনাথ বাবুর চেহারা আরো উজ্জ্বল বোধ হোলো। চোর-ছ্যাঁচোড়রা যেমন ঘুসি পেলেই খুসি হয়, পুলিসের লোকরা তেমনি কোন না কোন প্রকারে ঘুষ না পেলে তুষ্ট নন্; এদিক দিয়ে তাঁরা দেবতাদের প্রায় সগোত্র, এইরূপ শোনা যায়।

সিগ্রেট উপহার লাভে আদ্যনাথের উৎসাহ দেখা দিল।

"বল্‌ছি সব।" বল্লেন তিনি : "দাঁড়াও, বাজে লোকগুলকে আগে বিদেয় করে আসি।"

এই বলে, একজন পাহারোলার কাছ থেকে মোটা একটা লাঠি না কেড়ে নিয়ে কৌতূহলী জনতাকে তিনি তাড়া করলেন। দুইয়ে দুইয়ে, তিনে তিনে, চারে পাঁচে, জোড় বিজোড়ে ইতস্ততঃ যে সব ছোট খাট জনতা জমেছিল, সেই তাড়নায় বাত্যাতাড়িত জঞ্জালের মত ইতোনষ্ট হয়ে স্ততোভ্রষ্ট হয়ে পড়ল। এখান থেকে সরে ওখানে গিয়ে জমল। সেখান থেকে নড়ল না। নড়বে কেন? কথায় বলে খুন্ খারাপী। খুনের সাথে সাথে খারাপীরা লেগেই থাকে।

"ওসব খারাপ লোকদের ছেড়ে দাও।" বল্ল কান্তিকুমার : "এখন কাজের কথা বলো। পদচিহ্নের খবর কি?"

কান্তি সটান্ কাজের কথায় পড়তে চায়। "পায়ের দাগ পাওয়া যায় নি? না কি—সেদিকে এখনো দৃষ্টি দেওয়ার ফুরসৎ হয়নি তোমার?

"দিয়েছি।" জানালেন আত্মনাথ: "সব প্রথমেই পায়ের দাগে আমার লক্ষ্য ছিল। সারা বাগানটাই পায়ের দাগে ভর্ত্তি। এই যেমন ত্যাখো না—এই এক ধরণের পদচিহ্ন। একদম্ কাঠের পা।"

চাঁছাছোলা ঘাসালো জমির উপরে বিন্যস্ত এক জাতীয় বিশেষ দাগের প্রতি কান্তিকুমারের দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করলেন।

"এই দাগগুলো ত্যাখো। সহজে কি আমি দাগ পেয়েছি! এম্নি কি আমার আক্কেল গুড়ুম্ হয়েছে?"

কান্তিকুমার দেখ্ল।

"এই লোকটার একটা পা বেমালুম কাঠ। এই কাঠের পায়াওলা লোকটা—" বল্তে লাগলেন আত্মনাথ: "যদ্দূর মনে হয় কোনো জাহাজের খালাসী। দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা বলেই মনে হয়—এডেন থেকে এখন আস্ছে। অল্পদিন হোলো করাচীতে নেমেছে। করাচী থেকে ট্রেনে এসেছে কল্‌কাতায়। পায়ের দাগ দেখলেই এসমস্তই স্পষ্ট বোঝা যায়।"

কান্তিকুমার ঘাড় নাড়ল: "ঠিক।"

"আরো বোঝা যায়," বোঝাতে লাগলেন আত্মনাথ: "যে, এই লোকটার ডানহাতে একটা ছড়ি ছিল আর কোমরের ঘুন্সিতে বাঁধা ছিল ছোট্ট একটা হুইসিল্।"

"তা বেশ দেখতে পাচ্ছি।" কান্তিকুমার ভাবিত মুখে বল্ল,

"এই হুইসিল্‌টা ছিল আবার ডানদিকে বাঁধা। এই কারণে ডানদিকে লোকটার একটু ঝুঁকি পড়েছে তাও দেখা যাচ্ছে।" বোঝাটাকে কান্তি আরো একটু ভারী করে দেয়।

"তোমার কি মনে হয়, কান্তি, যে এই কেঠো পা খালাসীটাই এডেন থেকে এসে এই খুন্‌ করেছে?" আগুনাথ সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেনঃ "সেই কি করতে পারে তোমার ধারণা?"

"খুব পারে।" কান্তি বলেঃ "এই সব খালাসীরাই তো এই সব কাণ্ড করে থাকে। খুন্‌ করতে পেলে আর কিছু তারা চায় না। জাহাজ থেকে নেমেই তারা খুন্‌ করে। লাস আর খালাসীর মধ্যে কেমন একটা জড়াজড়ি ভাব রয়েছে দেখছ না?"

বড় দারোগা ঘাড় নাড়লেনঃ "এবার এই দাগগুলো ছাখো, মনে হয় যেন কোনো কাবলিওলার। সুদের তাগাদায় যাতায়াত করা পা—দেখলেই বোঝা যায়। খাতকের অপেক্ষায় ওৎপেতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা একনিষ্ঠ পা। এখানে সেখানে নড়ে চড়ে দাঁড়ালেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গেছে—এই পায়ের দাগগুলি দেখলে তাই কি মনে হয় না? ছাখো না, কি রকম মাটির মধ্যে বসে গেছে গভীর হয়ে—"

"হ্যাঁ।" কান্তি মাথা চালেঃ "এ লোকটাও খুন্‌ করতে পারে বটে।"

"এই রকম আরো কতো পায়ের দাগ।" আগুনাথ বিবৃতি ছান্‌ঃ "আরো কতো রকমের—কিন্তু সে সব কোনো কাজের নয়। বেশীর ভাগ ওই সব অকর্ম্মাদের।" এই বলে কৌতূহলী জনতার দিকে আগুনাথ ভ্রূভঙ্গী করেনঃ

"বাগানবাড়ীটা আমরা এসে ঘেরাও করে ফেলার আগে ওরাই তো জায়গাটা চষ্‌ছিল কিনা।"

"একটু থামো।" কান্তিকুমার কী যেন ভেবে নেওয়ার চেষ্টা করে। "আঙুলের ছাপ পাওয়া যায় নি?"

"আঙুলের ছাপ?" আদ্যনাথ হতাশভাবে ঘাড় নাড়েন: "আঙুলের ছাপের কথা আর বোলো না। সারা বাড়ীটাই আঙুলের ছাপে ভর্ত্তি।"

"তার মধ্যে বর্ম্মীর আঙুলের দাগ হতে পারে এমন কিছু পেয়েছো?" কান্তিকুমার উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করে।

"বর্ম্মীয় আঙুলের দাগ তিন রকমের পেয়েছি।" আদ্যনাথের মুখ আরো গম্ভীর হয়: "কিন্তু সে সব কোনো কাজের নয়!"

কান্তি আবার বিচক্ষণের মত মাথা দোলায়।

"কিন্তু দারোগা সাহেব," কান্তি নতুন সমস্যা নিয়ে আসে: "রহস্যময়ী নারীদের কি খবর? তাদের কাউকে দেখতে পাওনি এখানে এসে?"

"রহস্যময়ী নারী? দেখেছি। সকাল থেকে চারজন গেছে এ পর্য্যন্ত।" আদ্যনাথ বাৎলান: "একজন গেছে সকাল সাড়ে সাতটায়। একজন সোয়া নটায়। আর দুজন গেছে বারোটা বাজিয়ে—এক সঙ্গে—কাঁটায় কাঁটায় ঠিক বারোটায়। আদ্যনাথ বিষণ্ণ সুরে অনুযোগ করেন: "আমার মতে তারা প্রত্যেকেই রহস্যময়। সব মেয়েই আমার কাছে রহস্যময়ী বলে' মনে হয়।"

"আচ্ছা, এইবার অন্যদিক থেকে আরম্ভ করা যাক্"—কান্তি

বলে : "সমস্ত জিনিষটা নতুন করে' গড়বার চেষ্টা করা যাক্—নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে। যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে রহস্যের পার পেতে হবে—এই খুনের কিনারায় পৌঁছতে হবে। ভালো কথা, কৃত্তিবাস সেন কি আইবুড়ো ছিলেন—তাই না ?"

"আইবুড়োই বটে। বে থা করেননি, এবং এখন বুড়ো হতে চলেছিলেন। এতবড় বাগানবাড়ীতে একলাই থাকতেন তিনি।" আদ্যনাথ জানান।

"ভালো কথা। তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর এক পেয়ারের খানসামা ছিল। তা না থাকলে তাঁকে দেখত শুনত কে ? এবং সেই প্রিয় ভৃত্যটি নিশ্চয় তাঁর অতিশয় বিশ্বাসী আর পুরাতন—প্রায় বিশ বছর ধরে কাজ করছিল তাঁর কাছে ?"

আদ্যনাথ সায় দিলেন মাথা নেড়ে।

"তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বোধ হয় ?" কান্তি জিজ্ঞেস করল।

"সবার আগে। চাকরকে আমরা কখনো ছাড়ি না—ছেড়ে কথা বলি না। বিশ্বাসী পুরাণো চাকর হলে তো কথাই নেই। এবং তারাও ঠিক তাই প্রত্যাশা করে। বলব কি কান্তি, এই চাকরটা—নাম তার উদ্ধব—আমরা আসা মাত্রই আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করল ! পালাতে পারত, কিন্তু পালায়নি। গ্রেপ্তার হবার জন্যেই অপেক্ষা করছিল হয়ত।"

"ঠিকই হয়েছে।" কান্তি বলল : "তারপর দেখা যাক্। ঐ চাকর ছাড়া আর কে কে ছিল বাড়ীতে ? কোনো ঠাকুমা-দিদিমা স্থানীয়া ? কোনো বুড়ি ঝি, দাই মা গোছের—যে শিশু

অবস্থা থেকে কৃত্তিবাসকে মানুষ করে' তুলেছে। একেবারে বন্ধ কালা এ রকম কোনো মেয়েছেলে পাওয়া যায়নি বাড়ীতে?"

"একেবারে হুবহু।"

"তার মানে?"

"ঠিক ওই রকমের এক বুড়ি ঝি—দাই মা গোছের—যে কৃত্তিবাসের শৈশব থেকে—"

"বুঝেছি, আর বলতে হবে না। তা সেই মেয়েটি কি এতবড় এই হত্যাকাণ্ডের সময়ে কোনো কিছু শুনতে পায়নি? কোনো অস্বাভাবিক আওয়াজ? ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ—বা—?"

"টুঁ শব্দটিও না। তবে খুব সম্ভব, এটা তার বন্ধ কালামির জন্যই বোধ হয়।"

চতুর্থ কিস্তি

'ঐ মেয়েটিকে আমি বাঁচাবো'

"হ্যাঁ, তাও হতে পারে।" কান্তি ঘাড় নাড়লে। "আচ্ছা, ও ছাড়াও এই বাড়ীর পেছনে নিশ্চয় আস্তাবল আছে, সেখানে সহিস আর কোচম্যান বাস করে—ঘোড়াদের সঙ্গে। পেট্রল দুর্ল্লভ হয়ে অনেকেই মোটরের পাট তুলে দিয়ে আজকাল ঘোড়ার গাড়ীর চর্চ্চা করছেন—কৃত্তিবাস সেন নিশ্চয় তার অন্যথা ছিলেন না? তা, সেই সহিস্ কোচম্যান্‌রা কোথায়?"

"কোচম্যান্ এই খুনের রাত্রে সহিসকে নিয়ে কোন্ এক সিনেমায় হোল্‌নাইট্ শো দেখতে গেছল—বাবুর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে। ফিরেছে আজ সকালে। আমরা এখানে আসার পরে। কান্তি, ওদিকে সন্দেহ করবার কিছুই নেই—ওসব আমরা খুঁটিয়ে দেখেছি।"

"ওরা কজন ছাড়া আর কোনো ব্যক্তি কি ব্যক্তিণী কি ছিল না যে এই বাড়ীর সঙ্গে বা এই কৃত্তিবাসের সঙ্গে কোনো না কোনো প্রকারে বিজড়িত?"

"হ্যাঁ, ছিল। ছিল কেন, আছে। কৃত্তিবাস্ সেনের লেডি টাইপিস্‌ট্ অলকা দত্ত। কিন্তু সে আসে সকালের দিকে—কর্পোরেশন্ এবং কৃত্তিবাসের আপিস সংক্রান্ত কাজকর্ম্মের ব্যাপারে, রাত্রির কাণ্ড কিছুই সে জানে না।"

"তুমি কি এই মেয়েটিকে দেখেছো?" কান্তির সাগ্রহ প্রশ্ন: "মেয়েটি দেখতে কেমন?"

"দেখেছি—দেখবার মত।" জানালেন আদ্যনাথ: "দেখতে মন্দ নয়, সুশ্রীই।"

"এবার এই মেয়েটির পালা। এবার এ বিপদে পড়বে, চাই কি মারা পড়াও বিচিত্র নয়। একে ঘিরেই হত্যাকারীরা চক্রান্ত করবে এবার—স্পষ্ট আমি দেখতে পাচ্ছি।" দেখতে দেখতে কান্তিকুমার ভাবিত হয়ে পড়ে।

"কি করে বুঝলে?" আদ্যনাথও বিস্মিত হন্। "খুন হবার মত কোনো কারণ মেয়েটির কোথাও নেই।"

"সেইজন্যই তো খুন্ হবে। কৃত্তিবাসের মধ্যে তেমন কোনো কারণ ছিল না কি? সত্যি বল্‌তে, এই কৃত্তিবাসই কিছু রামায়ণ লেখেনি—রামায়ণের জন্যে দায়ী নয়। তবু এ খুন্ হোলো। কেন হোলো? এ মেয়েটিরও তেমনি কোনো দায় না থাক্‌লেও হত্যাকারীরা একে আদায় করতে পারে। কেন ছাড়বে কেন?"

আদ্যনাথ কিছুই বল্‌তে পারেন না। কেবল দাড়ি চুল্‌কান্।

"কিন্তু যতই তারা চেষ্টা করুক্, তারা ব্যর্থ হবে। বিপর্য্যস্ত হবে। হবেই। আমিই তাদের বিপর্য্যস্ত করবো। তাদের কুকর্ম্মে বাধা দেব, তাদের চক্রান্তজাল ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলব। এই মেয়েটিকে আমি বাঁচাব।"

পঞ্চম কিস্তি

রহস্য আরো নিবিড়

কান্তি এবার দারোগাকে বল্লঃ "আমাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে চলুন্।"

আত্মনাথ আগে আগে চল্ল। অত বড় আর অমন সুসজ্জিত বাড়ীর ভেতরে কি অক্ষুণ্ণ শান্তি। কোথাও যেন কিচ্ছু ঘটেনি।

"গোলমালের কোনো চিহ্ন দেখচিনে কোনোখানে।" বল্ল কান্তি।

"না।" জবাব দিলেন আত্মনাথবাবুঃ "কোথাও এক চুলের এদিক ওদিক ঘটেনি! তবে চুলচেরা ভাবে দেখলে তা বড় ঘটেও না। যে লোকটি খুন হয় কেবল সে ছাড়া আর সব কিছুই ঠিক ঠাক থাকে। তার নিজের দেহে ছাড়া আর কোথাও কোনো বিপর্য্যয় বড় দেখা যায় না।"

ড্রইং রুমের দ্বার মুক্ত করে' ভেতরে গেল তারা। ইলাহী ঘর, আশ্চর্য্য সব আস্‌বাবে সাজানো। "চেয়ে দেখ, এখানেও অত বড় বিপর্য্যয়ের কোনো লক্ষণ নেই।" বলেন আত্মনাথ।

জানালায় জানালায় পর্দ্দা নামানো, জামা-পরানো টেবিল-চেয়ার, চাদর-গায়ে-দেয়া পিয়ানো, ত্রিশঙ্কুর মত ঝোঝুল্যমান্ বিজলী বাতির ঝালর, সব যে যার যথাস্থানে যথাযথ রয়েছে। কোথাও কোনো ইতরবিশেষ ঘটে নি।

"এস ওপরে, বিলিয়ার্ডের ঘরে এস।" আদ্যনাথ বল্লেন: "লাস অবশ্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে—ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য। কিন্তু আর সব কিছুই ঠিক সেইভাবেই রাখা হয়েছে—এক চুল নড়ানো হয়নি।"

তারা দুজনে দোতলায় গেল। সিঁড়ি পেরিয়েই সামনে সেই বিলিয়ার্ড ঘর। প্রকাণ্ড বিলিয়ার্ড টেবল ঘরের মাঝখানটিতে, কিন্তু কান্তি তার প্রতি দৃক্‌পাৎ না করে' সটান্ জানালার কাছে ছুটে গেল। "হা হা হা!" বল্ল সে: "এখানে কী? কী দেখচি এখানে?"

দারোগার মাথা নাড়ায় কোনো উত্তেজনা নেই। তাঁর কণ্ঠস্বর শান্ত। একটুও বিচলিত না হয়ে তিনি বল্লেন: "হ্যাঁ, জানালাটা দেখলে মনে হয় বটে যে বাহির থেকে খোলা হয়েছে। ধারালো কোনো অস্ত্রের সাহায্যে খড়খড়িটা বার থেকে ফাঁক করা হয়েছে বলে বোধ হয়। জানালার বাহিরে কার্ণিশের জমাট্ ধূলোয় আন্দোলনের চিহ্ন ও দেখা যায়। মনে হয় অসাধারণ সাহসী কোনো লোক তলপেটের পর ভর দিয়ে খড়খড়ির ফাঁকে হাত গলিয়ে ধারালো কোনো অস্ত্রের সাহায্যে জানালার ছিট্‌কিনিটা—কিন্তু ও নিয়ে ব্যস্ত হবার কিছু নেই কান্তি বাবু। বৃথা মাথা ঘামিয়ো না! সব খুনখারাপির ব্যাপারেই ও হয়ে থাকে—প্রত্যেক কেসেই দেখা যায়।"

"সে কথা সত্যি।" কান্তি ঘাড় নেড়ে সায় দিল। এবার সে ঘরের ইতস্ততঃ তাকাতে লাগল। এবং তার কণ্ঠ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিস্ময়ের আবেক উচ্চধ্বনি উছলে উঠ্‌ল। "ওই

কুলুঙ্গিটা দেখেছ ? পর্দার প্রায় আড়ালে প্রকাণ্ড ওই তাকটা ? তাকিয়ে ছাখো !"

"বহু আগেই দেখেছি।" আত্মনাথ জানালেন : "কুলুঙ্গির জমানো ধুলোর মধ্যেও ছুশ্চিহ্ন দেখা গেছে। ধুলোর স্তর ইতস্তত: করা—বেশ নড়ানো চড়ানো। পায়ের দাগের ছাপও অস্পষ্ট দেখা যায়। অসাধারণ ক্ষিপ্র কোনো লোকের পক্ষে ঐ তাকের ওপরে লাফিয়ে উঠে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কিচ্ছু অসম্ভব নয়।"

"ছাদের কাছটা দেখেছো ?" কান্তি এবার নজর উঁচু করে। "ছাদের কাছের ঐ ঘুল্‌ঘুলিটা ? একটু অস্বাভাবিক আকারের নয় কি ? কি মনে হয় তোমার ? ওখানে ও কি একজন—?"

"স্বচ্ছন্দে। কড়িকাঠে দড়ি লাগিয়ে দেয়ালের গা বেয়ে উঠে একজন লোক অনায়াসে ঐ ঘুল্‌ঘুলির ফাঁকে শুয়ে থাকতে পারে। অসাধারণ ধুর্ত্ত কোনো লোক সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে বসবাসের জন্যে ঐ রকম জায়গাই বরং পছন্দ করবে !"

"এক মিনিট। থামো একটু।" কান্তির আবার নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে : "ঐ ভ্যানিটি ব্যাগের অর্থ কী ? ওখানে ঝুল্‌ছে—ঐ যে ?"

আধুনিক কোনো মহিলার অতি আধুনিকতার চূড়ান্ত উদাহরণস্বরূপ চমৎকার একটি ভ্যানিটি ব্যাগ্ দেওয়ালের গা-লাগা একটা আল্‌নার আঁকশিতে ঝুল্‌ছিল।

"হ্যাঁ, ওটার কথাও যে ভাবা হয় নি তা নয়।" বল্লেন আত্মনাথ : "ওতে আমরা হাত দিইনি—ওটাকে ওখানেই

রেখে দিয়েছি। কেমন যেন আমাদের মনে হয়েছে ওইখানেই এই রহস্যের কিনারা আছে। বিশেষ একটা মতলবেই ওটা অম্নি রেখে দেয়া হয়েছে। যে ওই ব্যাগটি নিতে আস্‌বে, সে যে এই খুনের সঙ্গে কোনো না কোনো রূপে জড়িত তাতে আর কিছু ভুল নেই। আমাদের ধারণা—"

কিন্তু কান্তি আর উক্ত ধারণায় কর্ণপাত করছিল না। সে তখন বিলিয়ার্ড টেবলের ধার ঘেঁষে গেছে।

"ছাখো ছাখো।" চীৎকার করে' উঠেছে সে: "এইবার বুঝি রহস্যের একটা কিনারা পাওয়া গেল। বিলিয়ার্ড্ বল্‌গুলোর পজিশন্ ছাখো। সাদা বল্‌টা টেবিলের ঠিক মধ্যেখানে আর লাল বল্‌টা টেবিলের শেষ পকেটের একেবারে ধারে ধারে। এর মানে কি, আত্মনাথ, মানে কি এর ?"

আত্মনাথ দারোগাকে তুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে কান্তি— আদ্যোপান্ত ধরেছে। তার চোখে উদ্বেগ—কণ্ঠে ব্যাকুলতা ক্ষুরধার দৃষ্টি দিয়ে আত্মনাথকে চুরমার করতে চায় যেন সে।

"আমার জানা নেই।" আদ্যনাথ জানালেন: "বিলিয়াড খেলা আমি জানিনে।" এই আকস্মিক জড়াজড়িতে তাঁকে যেন একটু বিরক্তই দেখা গেল।

"আমিও জানিনে।" কান্তি বল্ল: "কিন্তু আমাকে জানতে হবে এর রহস্য। এক্ষুণিই। এর উপরেই এই হত্যাকাণ্ডের আসল ফয়সলা নির্ভর করছে। কাছাকাছি বইয়ের দোকান নেই কোনো ? কিম্বা কোন লাইব্রেরী—ইংরেজি বইয়ের ? একটা বিলিয়ার্ডের বই যোগাড় করা দরকার।"

এই বলে' আর এক মুহূর্ত্ত না দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে কান্তি উধাও হয়ে গেল।

দারোগা আত্মনাথ স্তব্ধ হয়ে—চিন্তাপ্লুত হয়ে—দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত রোগা বলে তাঁর মনে হতে লাগল।

"চলে গেল!" অস্ফুট স্বগতোক্তি বেরুল তাঁর গলা থেকে—(তাঁর নিজের চিন্তাধারা ও মতামত নিজকে বিড়বিড় করে' জানানোর এই বিড়ম্বনা তাঁর বহুকালের—তাঁর এই বদভ্যাস থেকে মনে হয় দেয়ালের কাণ থাকায় তাঁর বিশ্বাস নেই)।

"আশ্চর্য্য! থরহরিবাবু কেন ওর উপরে নজর রাখবার জন্য আমাকে টেলিফোনে জানালেন—? কান্তির গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখার জন্য প্রত্যহ তিনি পঞ্চাশ টাকা করে দেবেন তাও বলেছেন। কিন্তু কেন যে!— ?"

ষষ্ঠ কিস্তি

'ও বিলিয়ার্ডের খড়ি নয়'

ইতিমধ্যে বিশ্ববার্ত্তা কার্য্যালয়ে থরহরি বাবুর বাড়ী যাবার সময় হয়েছে। কাজ সেরে তিনি হুক্ থেকে কোট্ পেড়ে নিয়ে নিজের গায়ে চাপাচ্ছেন। এমন সময়ে একজন কর্ম্মচারী, বোধ হয় মনিবকে খুসি করার মৎলবেই অযাচিত ভাবে এগিয়ে এল।

"আজ্ঞে, আপনার কোটের হাতায় সবুজ মত কী দেখা যাচ্ছে। কিসের যেন দাগ। বিলিয়ার্ডের খড়ির দাগ বলেই বোধ হচ্ছে যেন। মুছে দেব কি ?"

থরহরি ঘুরে দাঁড়ালেন। কর্ম্মচারীটির আপাদ-মস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেন একবার। তারপর বল্লেনঃ "এ বিলিযার্ডের খড়ি নয। ফেস্ পাউডার। বুঝেছ ?"

এই বলে' সেই বিরাট ব্যক্তিত্ব, এক কথায় বিলিয়ার্ডের চকের মত সেই লোকটিকেও যেন মুছে দিয়ে, শান্ত গম্ভীর পদক্ষেপে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিজের মোটরে গিয়ে উঠলেন।

সপ্তম কিস্তি

করোনারের তদন্ত

খুনের পরদিন করোনারের তদন্ত সুরু হোলো। কিন্তু তার ফলে পরিষ্কার হওয়া দূরে থাক্, নতুন নানান্ জট্ পাকিয়ে পেকে উঠে রহস্য যেন আরো জটিল হয়ে উঠল। ডাক্তারী পরীক্ষার দ্বারা বিশেষ কিছুই জানা গেল না—নির্ব্বিশেষে অনেক কিছু জানা গেল। উক্ত ডাক্তারের মতে মৃতের দেহে আঘাতের চিহ্ন সুস্পষ্ট। কণ্ঠনালীর উপর চাপ্ পড়ায় নিশ্বাস বায়ুর পথরোধে মৃত্যু ঘটেছে এমন সিদ্ধান্তও করা যায়, আবার আলজিভ আটকে গিয়ে মৃত্যু ঘটাও কিছু অসম্ভব নয়। গলগ্রন্থির অত্যধিক স্ফীতি দেখা যায়। এদিকে মস্তিষ্কের স্নায়বিক শিরাও বিচ্ছিন্ন। এই সব নানাবিধ লক্ষণ বা দুর্লক্ষণের মধ্যে ঠিক কোনটি নিশ্চিত রূপে মৃত্যুর কারণ বলা কঠিন।

তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার দেখা গেছে বটে। মৃতের পাকস্থলীতে আধসের টাক্ আফিম গোলা পাওয়া গেছে তরল পানীয়ের আকারে। এই সম্পর্কে করোনার কোর্টের সরকারী উকীল এবং উক্ত ডাক্তারের জিজ্ঞাসাবাদ বিশেষ তথ্যপূর্ণ।

"পাকস্থলীর মধ্যে আফিম গোলা ঐ পরিমাণে পাওয়া কি একটু অস্বাভাবিক নয়?" তিনি প্রশ্ন করেছেন: "বিশেষ করে একজন কাউন্সিলারের পাকস্থলীতে? আপনার কি মত?"

"একটু অস্বাভাবিকই বই কি।" উত্তর হয়েছে ডাক্তারের

"তবে সেটা সাধারণ পাকস্থলীর পক্ষেই প্রযোজ্য। একজন কাউন্সিলারের পেটে কিছুই অস্বাভাবিক নয়।"

"আধসের আফিম গোলা একটু বেশী পরিমাণের বলে' কি আপনার মনে হয় না?"

"তা ঠিক বলা যায় না।"

"তবে কি ওটা পরিমাণে কম আপনি বল্‌তে চান্?"

"না, তাও বল্‌তে চাই না।"

"আধসের আফিম গোলা গলাধঃকরণের ফলে মৃত্যু কি একান্তই অনিবার্য্য?"

"কোনো কাউন্সিলারের বেলায় তা নাও হতে পারে। হতেই যে হবে তার কোনো মানে নেই।"

"তবে কি—একজন কাউন্সিলারের পেটে আধমণ আফিম গোলা পেলেই আপনি আশ্চর্য্য হতেন? এবং সেটা মৃত্যুর কারণ বলে মনে হোতো?"

"মোটেই না। কাউন্সিলারদের হজমশক্তি সাধারণতঃই অসাধারণ।"

ডাক্তারী তদন্ত এইখানেই শেষ।

তারপরে কৃত্তিবাসের চাকর উদ্ধবের জবানবন্দী নেওয়া হয়েছে। তার কাছ থেকে অনেক রহস্য বার হয়েছে—কিন্তু তা রহস্যের উপর রহস্য। ম্যাগনোলিয়ার উপরে মালাই বরফ—পরস্পরে মিলে সমস্যাটা আরো জমজমাট্ হয়ে গেছে যোগফলে। উদ্ধব দিব্যি গেলে বলেছে দুর্ঘটনার দিনে সে নিজে হাতে আধ সের আফিম মিছরীর পানায় গুলে বিকেলের জলখাবারের সঙ্গে

বাবুকে দিয়েছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও জানিয়েছে, এটা তার বাবুর নিত্যকর্ম্মের মধ্যে—প্রত্যহের বৈকালিক জলযোগ। সরকারী উকিলের জেরায় সে বলেছে যে আফিমটা আধসের নয় আধ ভরি ছিল মাত্র, মিছরির পানাটাই ছিল আধসের। তবে দুটোয় মিলে আধসের আধ ভরি ওজন হওয়া যে অসম্ভব নয় এটা সে সম্ভব মনে করে। এই ভৃত্যটি, রবীন্দ্রনাথের পুরাতন ভৃত্যের মত সর্ব্বগুণান্বিত না হলেও, বিশ বছর ধরে কৃত্তিবাসের তদ্বির তদারক করছে সে কথাও জানা গেল।

ঘোড়ার গাড়ীর কোচ্‌ম্যানকেও পুংখানুপুংখ জেরা করা হোলো। প্রায় তিন বছর থেকে সে কৃত্তিবাস সেনের এখানে কাজ নিয়েছে—যুদ্ধের দরুণ পেট্রল দুর্লভ হয়ে বাবুর মোটরগাড়ী অচল হওয়ার পর থেকেই সে আছে বলা যায়।

"এ কথা কি সত্য যে দুর্ঘটনার দিনে কর্ত্তার সঙ্গে তোমার ভয়ঙ্কর কলহ হয়েছিল?" করোণারের উকীল জিজ্ঞেস করেছেন।

"হ্যাঁ সত্য, কর্ত্তা সিনেমা দেখার ছুটি দিচ্ছিলেন না বলেই।"

"কর্ত্তাকে তুমি খুন করবার ভয় দেখিয়েছিলে? সত্য কি?"

"না। সেকথা বলিনি।"

"কিন্তু লোকে যে শুনেছে তুমি খুন করব খুন করব বলে' চেঁচাচ্ছিলে?"

"কথায় কথায় আমার মাথায় এমন খুন চেপে গেছল যে আমার কোন কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। 'আমার মাথায় খুন চেপে যাচ্ছে, হুজুর, আপনি আমার সামনে থেকে চলে যান্।' এই কথাই আমি বলেছিলাম।" বল্ল কোচম্যান্।

অষ্টম কিস্তি

করোনারের কর নাড়া

"তখন খুন চাপেনি, এখন খুনটা চাপছ—তাই নয় কি ?"

"না হুজুর।" বলেছে কোচম্যান।

করোনার তাঁর নথিপত্রের প্রতি তাকালেন। "অলকা দত্তকে ডাকা হোক্।" তাঁর হুকুম হোলো। অলকা দত্তের নামোচ্চারণের সাথে সাথে সারা আদালতে চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল। অলকা ধীর পদক্ষেপে সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াল।

ছিপ্‌ছিপে লতানো চেহারা অলকার। তার ফর্সা মুখে অদ্ভুত এক দীপ্তি। প্রত্যেক অকাণ্ড কুকাণ্ডের সঙ্গে—সমস্ত বিপর্য্যয়ের মূলেই কোনো না কোনো মেয়ে জড়ানো থাকে। আদালতের মধ্যে ডিটেক্‌টিভ্ বইয়ের পাঠক যারা ছিল তাদের কাছে তা অজানা ছিল না। এই চমৎকার মেয়েটি কি এই বিদ্‌ঘুটে ব্যাপারের সঙ্গে কোনোরূপে জড়িত না কি ? সেই সব পাঠকদের মনে এই প্রশ্নটাই বড্ড ধাক্কা মারছিল।

মেয়েটী কিন্তু সত্যিই কাঁপছিল। সে যে খুব বিপন্ন বোধ করছে তার মুখচোখ দেখলেই তা মালুম হয়। কিন্তু তাহলেও

পরিষ্কার স্বরে, আস্তে আস্তে, মিষ্টি সুরে সে তার বক্তব্য বলে' গেল। তার সাক্ষ্যের কোনোখানেও একটু হোঁচট্ খেল না।

প্রশ্ন হোলো, "কৃত্তিবাস সেনের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক ?"

অলকা। আমি তাঁর লেডি টাইপিস্ট ছিলাম।

প্রশ্ন। কতোদিন ধরে এ কাজ করছেন আপনি ?

উত্তর। প্রায় বছর তিনেক্।

প্রশ্ন। কখন আপনি কাজে যেতেন এবং ফিরতেনই বা কোন সময়ে ?

উত্তর। আমি সকালের দিকেই যেতাম কেবল। বেলা দশটার মধ্যে আমার যা কাজ সব সেরে আমি বেরিয়ে পড়তাম।

প্রশ্ন। সেখান থেকে বেরিয়ে আপনি যেতেন কোথায় ?

উত্তর। চৌরঙ্গীর এক রেস্তরাঁয় কিছু খেয়ে টেয়ে বাড়ী ফিরতাম তারপর।

প্রশ্ন। রোজই কি আপনি ঐ রেস্তরাঁয় দুপুরে খেয়ে থাকেন।

উত্তর। হ্যাঁ, রোজ। এখনও।

প্রশ্ন। রেস্তরাঁটার নামটা কি আমরা জানতে পারি ?

করোনার সরকারী উকীলের এই প্রশ্ন বাতিল করে দিলেন—এ কথার উত্থাপন তিনি অনুমোদন করিলেন না।

জুরিদের একজন জিজ্ঞেস করল, "শর্টহ্যাণ্ড ও কি আপনার জানা আছে ?

"হ্যাঁ, পিটমানের।"

জুরিদের আরেক জনের, 'আপনি কি সিনেমায় যান্ টান্'

—এই প্রশ্নের জবাবে অলকা জানিয়েছে : হ্যাঁ মাঝে মাঝে, কেউ নিয়ে গেলেই।”

অলকার এই উত্তর আদালতের মনে খুব ভালো দাগ কেটেছে। তার সম্বন্ধে সজুড়ি করোনারের ধারণা একটু উচ্চতর হয়েছে যেন। এই একটি কথায় সেখানকার সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি লাভ করল অলকা।

কিন্তু সরকারী উকীল তথাপি প্রশ্ন তুললেন : “কুমারী অলকা দত্ত, একটি কথা কি আমরা জানতে পারি ? খুনের পরে বিলিয়ার্ড-ঘরে যে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলতে দেখা গেছে সেটি কি —সেটিকি আপনার ?”

করোনার হাঁ হাঁ করে পড়লেন—“না না। এ প্রশ্ন আমি কিছুতেই অনুমোদন করতে পারি না—” হাত নেড়ে তিনি বাধা দিলেন : “এ কথা কেন ? এসব অবান্তর কথা কেন ? এ প্রশ্ন থাক্। মিস্ দত্ত, আপনাকে আর কোনো কথার জবাব দিতে হবে না। আপনি এখন কাঠগড়া থেকে নামতে পারেন।”

নবম কিস্তি

কালুকে কি কেউ দেখেচ ?

কিন্তু সব চেয়ে বেশী সোরগোল পড়ল থরহরি বাবুর বেলায়। বিশ্ববার্ত্তার পরিচালক থরহরি বাবু তাঁর সাক্ষ্যে জানালেন কৃত্তিবাসের সঙ্গে খুনের দিন সন্ধ্যায় একত্র এক সাহেবী হোটেলে তিনি খানা খেয়েছেন। এমন কি তাঁকে নিজের মোটরে করে কাশীপুরের বাড়ীতেও তিনি পৌঁছে দিয়ে এসেছেন।

"আপনি সেদিন সন্ধ্যা ঠিক কটার সময় কৃত্তিবাস বাবুর বাড়ীতে গেছলেন ?" জিজ্ঞেস্ করলেন সরকারী উকীল: "এবং কতোক্ষণ ছিলেন তাঁর সঙ্গে ?"

"এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।" বল্লেন থরহরিবাবু। "কিছুতেই না।"

"কেন, এর দ্বারা কি আপনার এই ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়ার কোনো সম্ভাবনা আছে ?" জিজ্ঞেস করলেন করোনার— থরহরি বাবুকে।

"তা হতে পারে।" বল্লেন থরহরি।

"তাহলে এর উত্তর দেয়া না দেয়া আপনার খুসি। আপনি স্বচ্ছন্দে নিরুত্তর থাকতে পারেন। আইনতঃ সে অধিকার আপনার আছে।"

থরহরিকে এই কথা বলে' করোনার সরকারী উকীলের দিকে ফিরলেন: "তাহলে ওঁকে আর ওই প্রশ্ন করবেন না। উনি ক্ষুব্ধ হচ্ছেন। অন্য কিছু জিজ্ঞেস করুন।"

"আচ্ছা বেশ।" সরকারী উকীল থরহরির দিকে আবার ফিরলেন: "তারপর ওঁকে বাড়ীতে পৌঁছে দেবার পরে আপনারা দুজনে অনেক রাত পর্য্যন্ত বিলিয়ার্ড খেলেছিলেন—এ কথা কি সত্যি?"

"থামুন্ থামুন্!" করোনারের কাছ থেকে বাধা এল আবার: "করছেন কী! এ প্রশ্ন আমি কিছুতেই করতে দিতে পারি না। একেবারে সোজাসুজি—নিতান্ত খোলাখুলি এ কি অভদ্র প্রশ্ন! এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য তেমন সাধু নয়—এর মধ্যে বিচ্ছিরি কোনো ব্যাপারের যেন ইঙ্গিত রয়েছে মনে হয়। আপনি অন্য কোনো প্রশ্ন করুন।"

"বেশ, তাই।" ঘাড় নাড়লেন সরকারী উকীল। "আচ্ছা বলুন তো থরহরি বাবু, নীল রঙের এই খামখানা এর আগে আপনি কখনো দেখেছেন কি না?"

"আমার জীবনে না।" থরহরি জানালেন।

"অবশ্যই উনি দেখেন নি।" বল্লেন করোনার: "এ বিষয়ে দ্বিরুক্তি করার কি আছে? ওঁর মত মান্য ব্যক্তি কি অকারণে নিঃস্বার্থ ভাবে মিথ্যা বল্‌বেন। দিন তো দেখি খামটা, কী আছে ওতে?"

"আজ্ঞে, এই খামখানা নিহত কৃত্তিবাসের জামায় আল্‌পিন্ দিয়ে আঁটা ছিল, হুজুর

"তাই নাকি ?" বল্লেন করোনার : "কী আছে ঐ খামে ?"

আদালত-শুদ্ধ রুদ্ধশ্বাস স্তব্ধতার মধ্যে সরকারী উকীল নীল খামের ভেতর থেকে সবুজ রঙের একখানা কাগজ বার করলেন। সবুজ কাগজখানায় আবার ষ্ট্যাম্প লাগানো। সবুজ পত্রের লেখাটা তিনি পড়তে লাগলেন :

"আমি কাশীপুর কলকাতা নিবাসী শ্রীকৃত্তিবাস সেন বহাল তবিয়তে এবং সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় আমার এই সবর শেষ উইল করিতেছি। এতদ্বারা আমার স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তির সম্পূর্ণ দখল স্বত্ব আমার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং একমাত্র উত্তরাধিকারী শ্রীমান কালু সেনকে দিয়া গেলাম।"

সারা আদালত এই উইল শুনে একবার যেন খাবি খেল। কারো মুখে একটি কথা নেই। কেবল করোনার চারদিকে ঘুরে ফিরে তাকালেন একবার।

"কালু সেন কি এখানে উপস্থিত আছেন ?" হাঁক দিলেন করোনার।

কোনো উত্তর এল না।

"এখানকার কেউ কি এই কালু সেনকে দেখেছেন ?" আবার করোনারের শোনা গেল।

তবুও কোনো সাড়া শব্দ নেই।

আবার সেই একই প্রশ্ন তথাপি কাউকে নড়তে চড়তে দেখা গেল না।

"হুজুর, এই কালু সেনকে পাওয়া গেলেই এই মৃত্যুর

রহস্যের হয়ত কোনো কিনারা হতে পারে।" শেষ কথা বল্লেন সরকারী উকীল। "হলেও হতে পারে।"

দশ মিনিট ধরে গবেষণা করে' জুরি এবং জজ একমত হয়ে তাঁদের রায়ে এটাকে খুন বলেই সাব্যস্ত করলেন। কে বা কাহারা আগোচরে এসে কাশীপুরের কৃত্তিবাস সেনকে খুন করে' গেছে এই কথা তাঁদের রায় থেকে জানা গেল। আরও জানা গেল যে, এই কাণ্ডকে কিছুতেই আত্মহত্যা বলে গণ্য করা যায় না। জনৈক জুরি তাঁর স্বতন্ত্র রায়ে জানালেন, এই খুন যে শ্রীমান কালুর কীর্ত্তি, সে ছাড়া আর কারো না, সে বিষয়ে তিনি দশ টাকা বাজি ধরতেও রাজি আছেন।

করোনার উদ্ধব চাকরকে বেকসুর খালাস দিয়ে উক্ত কালুর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার করার হুকুম দিলেন।

দশম কিস্তি

কান্তি কিন্তু ক্লান্তি জানে না

হতভাগ্য কাউন্সিলারের ধ্বংসাবশেষ মর্গ থেকে উদ্ধার করে' স্বর্গের পথে রওনা করে' দেয়া হোলো। যতদূর সম্ভ্রম এবং সমারোহের সঙ্গে কাউন্সিলার-তুল্য একজনের সদ্‌গতি করা উচিত তার কোনোই ব্যত্যয় করা হোলো না। তাঁর শবযাত্রাকে শোভাযাত্রায় পরিণত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছিল—তবু কেবল কয়েকটা রাস্তার চ্যাঙড়া ছাড়া নিমতলা ঘাট অবধি শেষ পর্য্যন্ত কেউ গড়াল না। প্রত্যেক রাস্তাতেই এই চ্যাঙড়ারা স্বাভাবিক কৌতূহলবশে কিম্বা হরিবোল দেবার প্রলোভনে স্বর্গীয় কাউন্সিলারের পিছু নিয়েছিল, কিন্তু নিজেদের রাস্তার সীমানা পর্য্যন্ত এগিয়েই ফের পিছিয়ে এসেছে। যাই হোক, রিলে-রেসের মতন বদ্‌লে বদ্‌লে গেলেও, কোনো না কোনো রূপে এই চ্যাঙড়ারাই, কাউন্সিলারটির শূন্য স্থান পূর্ণ করার কোনো স্বার্থ বা সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও এই অপূরণীয় জাতীয় ক্ষতির মহিমা এবং মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেছে দেখা গেল।

কলিকাতা-মহানগরী আবার তার সুস্থ অবস্থায় ফিরে এল। কৃত্তিবাস সেন এবং তার মৃত্যুরহস্য আস্তে আস্তে ভুলতে বস্‌ল সবাই।

ভুলল না কেবল কান্তি। আহার নেই নিদ্রা নেই টো টো করে' ঘুরছে। রোদ নেই বৃষ্টি নেই (এবং সেইজন্যেই মাথায় ছাতা নেই) ঘুরছে সে। এই এখানে, ওই সেখানে—সর্ব্বত্র সে। কোথায় নেইকো? কালু সেনের সন্ধানেই ঘুরছে কান্তি। যেখানেই কয়েকজন জড়ো হয়ে গুলতানি করছে কান্তি হাজির, আর কিছু না, কালু সেনের খোঁজে। হাওড়া শেয়ালদার মত জায়গায়, হাজার হাজার লোক সর্ব্বদাই যেখানে ওতোপ্রোতো হচ্ছে—অনুক্ষণ কত যাত্রীর যাতায়াত—কান্তি মিত্র সেখানে ক্লান্তিহীন। এই সে এধারে, আবার সে ওধারে—প্রত্যেকটি লোকের মুখের ওপর গভীর এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত বুলিয়ে নিতে ব্যস্ত। একজন ষ্টেশনের কর্ম্মচারী একবার তো ওর ঘাড়খানাই ধরল—"কী হচ্ছে? কী হচ্ছে এ সব? লোকের মুখের দিকে অমন করে' তাকাচ্ছ কেন?" কান্তি বল্লে: "একজন দাগী আসামীর আমি সন্ধানে আছি। আমি ডিটেক্‌টিভ্।" "মাপ করবেন, আমি জানতাম না। কিছু মনে করবেন না," বলে কাঁপতে কাঁপতে সাত হাত পিছিয়ে গেছে সেই কর্ম্মচারী। গোয়েন্দা আর সাপ কাকে কখন ছোবল্ মারবে কেউ বল্‌তে পারে? শত হস্তেন গোয়েন্দানাং—একজন গোয়েন্দাও আরেক জনের একশ হাত তফাতে থাকে।

সারাদিন ধরে এধারে ওধারে নানাধারে কান্তি ইতস্ততঃ করছে। তার কামাই নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে চায়ের দোকানে বসে'—একটার পর একটা দোকানে—এবং যত চা-পায়ী যাচ্ছে আস্‌ছে তাদের ওপর নজর দিতে তৎপর।

এমন কি, তিনদিন সে ছুতোরের ছদ্মবেশ ধরে কি এক ছুতোয় থরহরি বাবুর বাড়ীর দ্বারদেশে ও কাটিয়েছে—যদি সেখান থেকে এই কালুর কোনো সন্ধান মেলে।

কিন্তু তথাপি এই কালুর কোনো হদিশ নেই। যতদূর জানা আছে উক্ত শ্রীমান্ তিন বছর আগে অবধি তার কাকা কৃত্তিবাসের আলয়ে থাকত—তারপর হঠাৎ সে একদিন কেন বলা যায় না, সেখান থেকে উধাও হোলো। এই পাত্তাড়ি গুটোবার পর থেকে আর তার কোনো পাত্তা নেই। সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, বিশ্ববার্ত্তার বিখ্যাত সম্পাদকীয় ভাষায় তখন এই মন্তব্য করা হয়। ধরণী দ্বিধাগ্রস্ত, হয়ে হাঁ করে তাকে গিলে ফেলল নাকি ?—এ প্রশ্নও তখন করা হয়েছিল।

এগারোর কিস্তি

'এই নাগ্‌রাওয়ালাকে এক্ষুণি পাক্‌ড়াও'

তিন বছর আগে বিশ্ববার্ত্তার সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাই বলা হোক্‌ না কেন, কান্তি কিন্তু হার মানার পাত্র নয়। উক্ত হাঁ করা ধরণী কে হতে পারে তা নিয়ে সে অবশ্যি একটু মাথা ঘামিয়েছিল। যেই হোক্‌, কৃত্তিবাস সেনের কর্পোরেশনের প্রতিদ্বন্দ্বী ধরণী সেন নয় এই বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হবার এক সপ্তাহ বাদেই সে আগ্তনাথের কাছে গিয়ে হাজির হোল।

"দারোগাবাবু," বল্ল গিয়ে কান্তিঃ "আমার আরো কতকগু'লি বিষয় জানার দরকার। আমাকে আর একবার কৃত্তিবাস সেনের কুটীরে নিয়ে চল তো।"

দুজনে আবার বরানগর কাশীপুরের সেই বিরাট অট্টালিকায় প্রবেশ করল। বিলিয়ার্ড ঘরে পা দেবার সময়ে কান্তি বল্ল: "প্রথমবারে হয়ত এখানকার কিছু কিছু আমাদের নজর এড়িয়ে গিয়ে থাক্‌বে। আদৌ তা অসম্ভব নয়।"

"তাতো হয়ই। নজর এড়িয়ে যায়ই তো।" কান্তি কুমারের অভিযোগে আগ্তনাথবাবু সায় দিয়েছেন।

"আচ্ছা এখন বলো তো," কান্তি আরম্ভ করে—(তারা তখন সেই বিলিয়ার্ড টেবলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে)—"এই খুনের ব্যাপারে তোমার নিজের ধারণাটা কি? তোমার, মানে

পুলিসের ধারণার কথাই আমি বল্‌ছি। ধারণাগুলি একে একে বাৎলাও তো—সবগুলিই আমার জানা দরকার।”

“আমাদের প্রথম ধারণা কী ছিল তাতো তোমার অজানা নয় কান্তি। এই হত্যাকাণ্ড এডেন্ থেকে সদ্য আগত কোনো এক পা ওয়ালা (আরেক পায়া কাঠের) দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীর দ্বারা ঘটেছে—এই ছিল আমাদের সব প্রথম ধারণা।”

“বেশ উচ্চ ধারণা। এমন কিছু অসঙ্গত নয়।” সায় দিল কান্তি।

“আমাদের ধারণায় এই লোকটা হচ্ছে কোনো মালবাহী জাহাজের খালাসী।”—এক ঘেয়ে সুরে একটানা পূর্ব্ব বৃত্তান্ত দিতে সুরু করল আদ্যনাথ। “এই লোকটা অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সাহায্যে ত্রিশ ফুট উঁচু এই বাড়ীর গা বেয়ে উঠে—একজন রাজমিস্ত্রিও সারা দিনে যার সাত ফুটের বেশি উঠ্‌তে পারে না—উঠে এই বিলিয়ার্ড ঘরের জানালার বাইরে পৌঁছে অসাধারণ কৌশলের দ্বারা বাহির থেকে খড়খড়ির খিল্ খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল। লোকটা যে অসাধারণ ধূর্ত্ত তাও বেশ বোঝা গেছল নিহত কৃত্তিবাসের গলায় প্যাঁচানো রুমালের অদ্ভুত পাক দেখে। ও রকম কড়াপাক্ কেবল ভবানীপুরের সন্দেশের দোকানে আর এডেনের ধাড়ী ধাড়ী বদ্‌মাইসের রুমালেই দেখতে পাওয়া যায়, এবং এও জানা গেছল যে লোকটার একটা পা একদম্ কাঠের - ”

বল্‌তে বল্‌তে আদ্যনাথ দারোগা থাম্‌লেন। তাঁকে যেন একটু চিন্তাকুল দেখা গেল।

"একটা পা একদম্ কাঠের—এই রকমই আমাদের ধারণা হয়েছিল প্রথম। কিন্তু কেন যে এরূপ ধারণা হোলো তা এখন আমি বল্‌তে পারব না। একদম্ আমার মনে পড়ছে না।"

"দূর দূর! কী যে বলো তুমি আত্মনাথ! এই ধারণা হবার কারণ এই যে বিলিয়ার্ড টেবলের এধারের মেহগণির ওপরে লোকটার হাতের চাপ পড়েছিল—এবং চাপটা বেশ একটু বেশি রকমই পড়েছিল—যেটা সাধারণ মানুষের চাপ হিসাবে ঠিক স্বাভাবিক নয়। তাই থেকেই বোঝা গেল যে লোকটার ওপরার্দ্ধের ভার নিম্নার্দ্ধের চেয়ে গুরুতর—তাই নয় কি? তাই থেকেই লোকটার কাঠের পা সম্বন্ধে ধারণা জন্মালো—পায়ের দিকটা তার মাথার দিকের চেয়ে হাল্‌কা বলেই না?—এই কাঠের ধারণা তার সম্বন্ধে এমন কিছু কঠোর ধারণা নয়। কিন্তু এই প্রথমকার ধারণা এখন আমরা বর্জ্জন করেছি। তাই নয় কি?"

"নিশ্চয়ই। প্রথমকার ধারণা আমরা প্রথমেই বর্জ্জন করে থাকি। আমাদের চিরকালের দস্তুর। আমাদের দ্বিতীয় ধারণা হচ্ছে—"

কিন্তু কান্তির কাণ আর সেদিকে ছিল না। মেজের ওপর কী যেন সে তীব্র নেত্রে নিরীক্ষণ করছিল।

"হাঃ হাঃ! একি দেখছি মেজেয়?"—আনন্দ কি দুঃখ কিসের আবেগে বলা যায় না। পুনঃ পুনঃ কান্তির অট্টহাসি শোনা গেল "এর অর্থ কী? হাঃ হাঃ হাঃ।"

মেজের একটি অমার্জ্জিত জায়গায় আত্মনাথের দৃষ্টি সে আকর্ষণ করল।

"এ তো আমরা দেখিনি।" বল্লেন আছনাথ। "আগে তো দেখিনি।"

"পায়ের দাগ।...পায়ের নয়, জুতোর।" বল্‌তে বল্‌তে কান্তি পকেট থেকে ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস্ বার করে' পরীক্ষা করতে সুরু করল।

"এক জোড়া জুতোর ছাপ্—একটাও তার কাঠের নয়। নাগরা জুতো বলেই মনে হচ্ছে—লক্ষ্ণৌয়ী নাগ্রা। তবে আগ্রার হওয়াও আশ্চর্য্য না। জুতোর তলায় বড় বড় কাঁটি মারা—কিম্বা ঘোড়ার পায়ে যেমন নাল্ লাগানো হয় তাও হতে পারে লোকটা পাঁচ ফুট—সাড়ে ন ইঞ্চি লম্বা—"

"একটু সবুর করো, কান্তি!" আছনাথ বাধা দিয়ে বল্লেন: "তুমি যে কী বল্‌ছ আমি ঠাওর করতে পারছি না। লোকটা যে ঠিক অতটাই লম্বা তা কি করে তুমি জানলে?"

"পায়ের পাতার পরিধি থেকে পা কতখানি উঁচু তা ধরতে পারছি। আর পায়ের দৈর্ঘ্য পেলে লোকটার আসল উচ্চতা টের পেতে আর অসুবিধা কি? আছনাথ, এই নাগরাওলা লোকটাকে এক্ষুণি পাকৃড়াও। ওকে পেলেই এই খুনের রহস্য ভেদ হবে।"

এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সিঁড়ি দিয়ে নাগরা জুতোর খটাখট্ শোনা গেল। বিলিয়ার্ড ঘরের দরজা খুলে সেই নাগরাওয়ালা প্রবেশ করল তারপর।

কান্তি এবং আছনাথ দুজনেই এক সঙ্গে চম্‌কে উঠলেন।

মন কি, সেই ঘরে চোখের সামনে তখন নাগ্রাপ্রপাত দেখলেও বোধ হয় ততখানি বিচলিত হতেন না।

লোকটা ঠিক পাঁচ ফুট সাড়ে ন ইঞ্চি লম্বা। পায়ে তার নাগ্রা (লক্ষ্মৌ বা আগ্রা যেখানকারই হোক্)। লোকটার পরণে কোচম্যানের পোষাক! আদব কায়দা কেতাদুরস্ত।

পরলোকগত কৃত্তিবাসের ঘোড়ার গাড়ীর কোচম্যান দেখবামাত্র বুঝতে কান্তি বা আদ্যনাথের কোনো বেগ পেতে হোলো না।

"আপনিই কি কান্তি বাবু?" জিজ্ঞেস করল সেই কোচ-ম্যান; "একটি ভদ্র মহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক।"

বারোর কিস্তি

'কান্তিবাবু, আপনি বাঁচান্ আমায়।'

পর মহূর্ত্তে সিঁড়িতে প্রায় নিঃশব্দ পদধ্বনি শোনা গেল। লম্বা এবং চমৎকার একটি তরুণী অতি আধুনিক বেশ ভূষায় সুসজ্জিত হয়ে ঘরের মধ্যে পদার্পণ করলেন।

কুমারী অলকা দত্ত।

অলকার সাজ সজ্জায় আধুনিকতার অত্যন্ত উগ্রতা থাকলেও তার হাতে যে ভ্যানিটি ব্যাগ ছিল না তা কান্তির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায়নি।

"কান্তিবাবু," অলকা উচ্ছ্বসিত স্বরে বললঃ "আপনিই কান্তিবাবু, তাই না? এরা বল্‌ছিল যে আপনি এখানে এসেছেন কান্তিবাবু, আপনি বাঁচান আমায়।"

অলকার দেহ থরথর কাঁপছিল। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছিল তার।

"শান্ত হও কুমারী অলকা দত্ত।" সান্ত্বনার ছলে বল্ল কান্তি। বিচলিত হোয়ো না। এত ঘন ঘন তোমার নিশ্বাস খরচ কোরো না। এমন হাঁস ফাঁস করবার কি আছে? আমাকে বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে নির্ঘাত বাঁচাব।"

"আমারো তাই বিশ্বাস।" নিশ্বাসের দ্রুতগতি অনেকটা কমিয়ে এনে বল্‌ল অলকা।

"কী বলবার আছে আমায় বলো তুমি।" বল্ল কান্তি।

"কান্তিবাবু,—"নিজেকে সাম্‌লাতে পারলেও তখনো অলকার গলা কাঁপ্‌ছিল, "আমার ভ্যানিটি ব্যাগটা আমি চাই।"

"বোসো। দিচ্ছি এনে।" এই বলে, কান্তি আল্‌নার আঁকৃশি থেকে ব্যাগটা পেড়ে এনে অলকার হাতে তুলে দিল।

"আঃ, এটা ফিরে পেয়ে আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে। কী বল্‌ব!" ব্যাগটাকে আদর করে' নিজের গালে একবার বুলিয়ে নিল অলকা। "আপনাকে যে কি ভাষায় ধন্যবাদ জানাবো জানিনে। এটা নিতে আসতে আমার যা ভয় করছিল।"

"না না, ভয়ের কোনো কারণ নেই।" আদ্যনাথ বাবু জানালেনঃ "পুলিসের ধারণায় এই ব্যাগ্‌টা হচ্ছে এই বাড়ীর বুড়ি ঝির। আপনি স্বচ্ছন্দে এটা নিতে পারেন।"

কান্তি কিন্তু মেয়েটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল—আমার মনে হয় এই খুনের ব্যাপারের অনেক কিছুই তুমি জানো! সত্যি কি না? তাহলে আমাকে বলো সে সমস্ত।"

"বল্‌ব। আমি বলব কান্তিবাবু! ওঃ, কী ভয়ঙ্কর সেই রাত—ভাবলে এখনো আমার বুক কাঁপে। এখানেই ছিলাম আমি তখন। সব দেখেছিলাম—না দেখলেও—নিজের কানে শুনেছি সব।"

অলকা বারম্বার কেঁপে উঠ্‌ল।

"ওঃ কান্তিবাবু, এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমি জীবনে দেখিনি। সেদিন সন্ধ্যায় আমি এখানে এসেছিলাম। হাতের অনেক কাজ বাকী পড়েছিল, সেগুলো সারতে এসে ছলাম। কৃত্তিবাস বাবুর সেদিন সন্ধ্যায় কোথায় যেন নেমন্তন্ন ছিল শুনেছিলাম, কাজেই নিরিবিলি আপিস ঘরে বসে আমার কাজ সারতে কোনো বাধা হবে না ভেবেছিলাম। যখন এলাম; কেউ ছিল না তখন। এই বিলিয়ার্ডঘর পেরিয়েই তো গেলাম—এখানের আলনায় আমার ভ্যানিটি ব্যাগ রেখে ওপাশের আপিস ঘরে গিয়ে নিজের কাজে মন দিয়েছি—কতক্ষণ একমনে কাজ করেছি তা মনে নাই—হঠাৎ এই বিলিয়ার্ড ঘরের থেকে চেঁচামেচি আমার কানে গেল। চেঁচামেচি ক্রমশঃ ঝগড়া হয়ে দাঁড়াল—দুজনের দারুণ কলহ—শুন্‌লাম। সমস্তই নিজের কানেই শুনতে হোলো। শোনা খুব অন্যায় হয়েছে কি, কান্তিবাবু?"

"কিছুমাত্র না।" বল্ল কান্তি: "চোখের পাতা বোজা যায়—অবাঞ্ছনীয় দৃশ্য আমরা ইচ্ছা করলে নাও দেখতে পারি।

কিন্তু কানের পাতা বোজবার যে কোনো উপায়ই বিধাতা রাখেন নি, অলকা দেবী।”

“আপনার কথা শুনে আমার শরৎবাবুর উপন্যাসের কথা মনে পড়ছে, কিন্তু সে-কথা থাক্, কান্তিবাবু। তারপর কী শুন্‌লাম, শুনুন্। একজন বল্‌ছিল, “য়্যায়্, কি হচ্ছে? তুমি টেবিলের ওপর অতটা ঝুঁকি দিচ্ছ কেন?” আরেকজন বল্ল, “আমার খুসি!” তখন প্রথম জন বল্ল, “টেবিলের ওপর থেকে তোমার ভুঁড়ি সরিয়ে নাও। হটাও তোমার ভুঁড়ি।” দ্বিতীয় জন বল্ল—“হটাবো না। আমার ভুঁড়ি আমার—তোমার কি?’ তখন সেই ১ নম্বর লোকটা বল্ল—ভয়ঙ্কর গর্জ্জে উঠল এবার “তোমার ভুঁড়ি তোমার? বটে? এক্ষুণি সরিয়ে নাও বল্‌ছি নইলে এই পিস্তলের গুলিতে, দেখচ ত, ঐ ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেব।” তারপর একটুক্ষণ চুপচাপ। তার একটু বাদেই আর্ত্তনাদ শুনতে পেলাম—“ফাঁসিয়েছ, ফাঁসিয়েছ! সত্যিই তুমি আমার ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিলে?” তখন অপর ব্যক্তিটি, নরম গলায় একটু অনুতপ্ত সুরেই বল্ল যেন, “আমায় ক্ষমা করো। আমি ফাঁসাবো বলে’ ফাঁসাই নি। আমার গুলি যে তোমার ঐ গণ্ডারের চাম্‌ড়া ভেদ করতে পারবে এ বিশ্বাস আমার ছিল না।”

অলকা একটু দম নিল। কান্তি ও আদ্যনাথ বল্লঃ “তারপর? তারপর কী হোলো?”

“তারপর আমার এমন ভয় হোলো আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না। হুদ্দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পালিয়ে একছুটে নিজের বাড়ীতে চলে এলাম—পরদিনের খবরের কাগজে সে-

রাত্রির সমস্ত ঘটনা জানা গেল। আমার ব্যাগটা বিলিয়ার্ড ঘরে পড়ে আছে তাও জানতে পারলাম। তারপর থেকে যে কী ভয়ে ভয়ে রয়েছি—কান্তিবাবু, আপনি আমাকে বাঁচান্।"

"অবশ্যিই বাঁচাবো, তুমি ভয় খেয়ো না, অলকা দেবী। নির্দ্দোষকে কেবল মারা নয়, মাঝে মাঝে বাঁচানোও, আমাদের গোয়েন্দার ধর্ম্ম বই কি। তুমি ঠাণ্ডা হও। এখন একটা কথা আমায় বলো দেখি। যে লোকটা কৃত্তিবাস সেনের বিপক্ষে খেল্‌ছিল—তাকে কি তুমি দেখেছিলে?"

"একবার মাত্র, চকিতের জন্যই।" বল্‌তে একটু ইতস্ততঃ করল অলকা: "দরজা একটুখানি ফাঁক করে'—সেই ফাঁকে একটু ঈষৎ দেখেছিলাম।...খুব অন্যায় করেছি, মাপ করবেন।"

"কি রকম দেখতে লোকটা?" জিজ্ঞেস করল কান্তি: "মুখ দেখলে কি মনে হয় তার মনের মধ্যে প্রবেশ করা অতীব দুঃসাধ্য ব্যাপার? খুব দুর্ভেদ্য—অনেকটা এইরকম মুখ কি?" কান্তিমিত্র কায়ক্লেশে নিজের মুখে অলকার সম্মুখে দৃষ্টান্তটা দেখাবার চেষ্টা করে।

"অবিকল।"

"প্রকাণ্ড লম্বা চৌড়া একটা মুখ—মনে হয় সমস্ত দেহে কেবল শুধু ঐ মুখখানাই আছে?"

"তাই মনে হয় বটে।"

"অলকা দেবী," কান্তি জানাল: "এই খুনের রহস্য আমি প্রায় ভেদ করে' এনেছি। যখন বাকিটুকুরও কিনারা করতে

পারব তখন সমস্ত গল্পটা আগাগোড়া এসে বলব তোমায়। তুমি শুনবে তো ?"

কান্তি ভরাট দৃষ্টি দিয়ে তাকালো অলকার মুখে।

"শুনব বইকি! আপনি বলবেন, আমি শুনব না ?" জবাব দিল অলকা। "আপনার কথা শুনব না—কী বলেন!"

এবং এই কথা বলে' কুমারী অলকা দত্ত নিজের ব্যাগ হাতে নিয়ে তেম্‌নি নিঃশব্দ আওয়াজে নীচে নেমে গেল।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই কান্তি টেলিফোন্ হাত করেছে: "হ্যালো, এটা কি বিশ্ববার্ত্তা আপিস ? য়্যাঁ ?···বিশ্ববার্ত্তা ?··· বড়কর্ত্তার ঘরে দাও।·· ও—আপনি ?···বড়কর্ত্তা ?···আমি— আমি কান্তি। কাশিপুরের রহস্য আমি সমাধান করেছি।..."

বলেই কান্তি মুহূর্ত্তখানেক কান-খাড়া করে' রইলো— প্রতীক্ষা করতে লাগল। কিন্তু থরহরিবাবুর কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য পাওয়া গেল না। অবিচলিত স্বরে তাঁর জবাব এল:

"কালু সেন কি ধরা পড়েছে ?"

"থরহরিবাবু, কেবল কালু সেন নয়, এই মৃত্যু রহস্যের আগাগোড়া আমি ধরেছি। ধরতে পেরেছি।—" কান্তি বল্ল, তার বলার কায়দায় আর প্রত্যেকটি কথায় বিশেষত্ব দিয়ে—বিশেষ ব্যঞ্জনা দিয়ে বল্ল কান্তি—"কার মৃত্যু তা সকলেই আমরা জানি খুড়ো কৃত্তিবাস মরেছেন, এইটুকুই জেনেছি কেবল। এবং এও জানা গেছে যে কৃত্তিবাসের ভাইপোই তাঁকে মেরেছে। কিন্তু কেন মেরেছে, কি ভাবে মেরেছে এবং সেই ভাইপোই বা কোথায় এখন অবধি তার কিছুই আমরা জানতাম না। মৃত্যু-কাহিনীর এই

পরিচ্ছেদগুলো পাওয়া যাচ্ছিল না। এই পরিচ্ছেদগুলোকেই আমি পাকড়েছি. এই কথা বলতে চাই আপনাকে।”

“বটে ? বেশ তো।” অচঞ্চল স্বরে বল্লেন থরহরি। “বেশ।”

“এবং এই কাহিনীটাই আগাগোড়া, পরিচ্ছেদের পর প রচ্ছেদ আপনাকে আমি শোনাতে চাই।”

“কিন্তু এই টেলিফোন্ কানে শোনা তা কি সম্ভব হবে ? যদি হয় তো শোনাও। ছ'মিনিটের মধ্যে সারতে পারলে আমার আপত্তি নেই।”

কিন্তু ছ'মিনিটে রামায়ণ গান, স্বয়ং রামচন্দ্র কান পাত্‌লেও, বোধ হয় শোনানো যায় না। কান্তি খানিক ইতস্তত করে, স্বভাবতঃই। কিন্তু বেশিক্ষণ সে ইতস্তত করে না।

“গল্পটা টেলিফোনে না বলে' বিলিয়ার্ডের টেবিলে বল্লে বোধ হয় ভালো শোনাবে। সচিত্র করে' বলা যাবে হয়তো।”

“তার মানে ?” থরহরি প্রশ্ন করলেন।

“তার মানে, আপনি বিশ্ববার্ত্তা থেকে সোজা আপনার বাড়ীতে আস্থন। আমিও যাচ্ছি। সেখানে আমাদের ছ'জনের বিলিয়ার্ড খেলার ভেতর দিয়ে আমার বক্তব্যটা ব্যক্ত করব। এই ব্যাপারটার এমন কতকগুলি বিশেষ দিক আছে যা বিলিয়ার্ডের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে না দেখলে ধরা পড়বে না। যদি আপত্তি না থাকে, আপনাকে পঞ্চাশ পয়েন্টের খেলায় চ্যালেঞ্জ করতে আমি প্রস্তুত—তার মধ্যেই খেলা এবং গল্প ছুই আমার শেষ হবে। বেশিক্ষণ আপনাকে কষ্ট দেব না।”

থরহরি বল্লেন : “বেশ।”

'শেষ হোলো তো ভালোই, নইলে তোমাকেও আমি শেষ করব।'—সেই সঙ্গে এই কথাও তিনি মনে মনে বল্লেন কিনা কে জানে। থরহরির দুর্গম মনস্তত্ত্বে প্রবেশ লাভ করা যে কোনো কল্পনা-কুশল লেখকের পক্ষেও অসাধ্য।

থরহরিকে বিলিয়ার্ডে চ্যালেঞ্জ করা একটা যা তা নয়। তাঁর মতো ধীর মস্তিস্ক এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ খেলোয়াড় কলকাতায় খুব কমই আছে। তাঁকে বিলিয়ার্ডে হারাতে কদাচ কেউ পেরেছে। একচোটে নয়, দশ, এমন কি বারো পর্য্যন্ত মারবার তাঁর সুখ্যাতি শোনা যেত। টেবিল থেকে বল্ উড়িয়ে দেয়া তো তাঁর পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার। তিনটে বলের কে কোথায় রয়েছে তাঁর শ্যেন-দৃষ্টির কাছে এড়াবার যো ছিল না—এবং তাদের কোনটাকে কি ভাবে পিটতে হবে স্বভাবতই তিনি বুঝতে পারতেন।

তবে কান্তিও প্রতিপক্ষ হিসাবে কিছু কম ছিল না। আনাড়ির মার বলে' একটা কিছু আছে—কান্তির ছিল সেই সুবিধা। কান্তি একদম্ আনাড়ি। বিলিয়ার্ডের বিষয়ে অল্প-দিনের পুঁথিগত বিদ্যা তার। তবে সাংবাদিকরা পারে না কী? হয়কে নয় করতে তাদের তুল্য কে আছে? সংবাদপত্রের রিপোর্টারের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। কাজেই, এর আগে কখনো না খেললেও' কান্তি কোনো অংশে কম যায় না।

কান্তির অদ্ভুত বিলিয়ার্ডি চাল্! কুশনের আড়ালে নিজের বল্ রেখে, প্রতিপক্ষের আঘাত থেকে রক্ষা করেছে এবং তার নিজের মারের বেলায় সেই বল্ হয় সবেগে নয় একলাফে ধারের পকেটে গিয়ে স্থান লাভ করেছে।

স্কোর্ খুব চট্‌পট্ বেড়ে উঠল—দুজনেই প্রায় সমান সমান। আধ ঘণ্টা খেলার শেষে এরও দশ ওরও দশ। থরহরি তাঁর ভারী মুখ আরো ভার করে' উঠে পড়ে লেগেছেন—টেবিলের ওপরে তাঁর এক পা। কান্তি, উত্তেজনার চূড়ান্ত সীমায় উঠেও অতীব শান্ত, বলের ওপরে ঝুঁকে পড়েছে। বল্ আর তার চোখের মধ্যে এক ইঞ্চির ফারাক্।

পনেরর সময়েও তারা সমান। থরহরি হঠাৎ একচোটে তিন পয়েণ্ট মেরে বসেছে কিন্তু এ চোটও সাম্‌লে নিয়েছে কান্তি। আরো মিনিট কুড়ির খেলার পর দুজনে উনিশে এসে আবার সমকক্ষ হয়েছে।

কিন্তু কান্তিকুমার মিত্রের মনে খেলায় জেতা ছাড়াও অন্য আরো কিছু বুঝি ছিল। এইবার সেটা পরিষ্কার হয়ে পড়ল। তার সুযোগ এল এতক্ষণে। দক্ষ হাতের এক মারে, খুব ওস্তাদও কদাচ যা পারে, কান্তি থরহরির বলকে বেশ একহাত দেখে নিল। লাল বল্‌টা পকেটের হাঁ-এর মুখে গিয়ে দাঁড়ালো। সাদা বল্‌টা টেবলের ঠিক মাঝখানে।

কান্তি থরহরির মুখের দিকে তাকিয়ে।

বল্‌গুলি ঠিক সেই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে—কৃত্তিবাসের মৃত্যু-তিথিতে তার বাড়ীর টেবিলে ঠিক যেমনটি করে' দাঁড়িয়েছিল।

"আমি ইচ্ছা করেই ওরকমটা করেছি।" বল্ল কান্তি। সহজ সুরেই বল্ল।

"তার মানে?" জিজ্ঞেস করলেন থরহরি।

বলের ঐরূপ অবস্থা দেখেও তিনি যে কিছু দুর্ব্বল হয়েছেন তা মনে হোলো না।

"তার মানে, ঐ বলের মধ্যেই রয়েছে।" কান্তি জানাল। "থরহরিবাবু আসুন, এবার একটু বসা যাক্। আপনাকে আমার কয়েকটি কথা বলার আছে। অবশ্যি যা বলব তা আপনার অজানা নয়। আপনি বুদ্ধিমান, ইতিমধ্যেই তা আঁচ করতে পেরেছেন।"

কান্তির কথাতেও বেশ আঁচ। তার ভেতরে যে আগুণ জ্বল্‌ছিল তারই আঁচ বোধ হয়। কান্তি আজ অগ্নিকাণ্ড না করে' ছাড়বে না। যে থরহরি, সারা বিশ্ব মায় বিশ্ববার্ত্তাকে থরহরি-কম্পিত করে' রাখেন, তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এখনো সে অকম্পিত।

দুজনে মুখোমুখি দুটো কুশন্ অধিকার করে' বস্‌ল। থরহরি শান্তভাবে একটা সিগ্রেট ধরালেন। মনে হোলো তাঁর হাত যেন একটু কাঁপল—সিগ্রেট্ ধরানোর সময়ে। চকিতের জন্যই মনে হোলো কান্তির।

"বেশ।" সিগ্রেট মুখে তিনি প্রশ্ন করলেন—"কি বল্‌তে চাও বলো ?"

"থরহরিবাবু,—" কান্তির কান্তি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মনে হয়—"দু'সপ্তাহ আগে আপনি আমাকে এক জটিল রহস্য সমাধানের ভার দিয়েছিলেন। তার কিনারা আমি করেছি। আজ রাত্রে—এই মুহূর্ত্তে—এখনই সেই সমাধান আপনাকে জানাতে পারি। আপনি কি জানতে চান্ ?"

থরহরির কপালে কি কপোলে একটিও রেখা পড়ল না।

"বেশ তো।" বল্লেন তিনি। "জানাই যাক্ না!"

"একটা মানুষের জীবন বিলিয়ার্ড খেলায় শেষ করে' দেয়া যায়—স্বচ্ছন্দেই যায়—তাই না, থরহরিবাবু?" কান্তি বলে: "আপনার কাছে অপরের জীবনের দাম বিলিয়ার্ডের চেয়ে বেশি নয়—তাই নাকি?"

"তার মানে? তুমি বল্‌তে চাও কি?" এইবার থরহরির হুঙ্কার শোনা গেল: "তুমি কি বল্‌তে চাও শুনি?"

"তার মানে তুমি—তুমিই খুন করেছ কৃত্তিবাসকে।" কান্তি বল্‌ল দৃঢ়স্বরে। থরহরির সামনে দাঁড়িয়ে কোথ্‌থেকে যে, কেবল স্বরে নয় ব্যঞ্জনাতেও তার দৃঢ়তা এল কে জানে! এবং নিজের আমিত্বের পুষ্টির সাথে সাথে থরহরির সঙ্গে আপনা-আপনিত্বও যেন সে ভুলে গেল। স্রেফ্ তুমিত্বে তাকে পর্য্যবসিত করতে একটুও তার দ্বিধা হোলো না।

"তুমিই—বিশ্ববার্ত্তা-পরিচালক শ্রীযুক্ত বাবু থরহরি দত্ত—দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশীল, চক্রান্তকারী এবং বদ্‌মায়েস—এতদিনে তোমার স্বরূপ এবং চাল-চলন প্রকাশ পেয়েছে। তুমি ধরা পড়েছ।"

থরহরির বিপক্ষে তার মনে তার নিজের অগোচরে এতদিন ধরে তার এত রাগ এবং এত বেশি বিরাগ পুঞ্জীভূত হয়েছিল তা কান্তি নিজেই জান্‌ত না—কিন্তু কেন যে হয়েছিল তা না জান্‌লেও—এবার তা প্রকাশের সরল এবং সঙ্গত পথ পেয়ে তার সমস্ত উষ্মা যেন লাভাপ্রবাহের মত টগ্‌বগ্ করে ছড়িয়ে পড়তে

লাগল। থরহরিকে ধরে' থোড়ের মত কুচি কুচি করে কাটতে পারার মধ্যে যে এত আনন্দ আছে তা সে জানত না। হাতীকে কাত দেখতে পেলে হস্তাদলিতদের যে অপার্থিব আনন্দ দেখা যায় এ বুঝি সেই আনন্দ।

"কুচক্রী, ভণ্ড এবং বিশ্বাসঘাতক—বাবু থরহরি দত্ত ওরফে—তোমার আসল নাম বল্‌তে আমার কোনো কুণ্ঠা নেই আর—ওরফে কালু সেন—তুমিই হচ্চ কৃত্তিবাস সেনের হত্যাকারী।"

তবু, তথাপিও থরহরির কপালের একটি শিরাও কাঁপল না। একটিও কথা না বলে' তিনি উঠে দাঁড়ালেন। কান্তিও উঠে দাঁড়াল সেই সঙ্গে। একটিও কথা না বলে' থরহরি কান্তির গালে সজোরে এক চপেটাঘাত করলেন। সেই থাপ্পড়টাই যেন তাঁর একটি মাত্র কথা। যারপর-নাই কথা।

"তার মানে?" কান্তি গালে হাত বুলোতে বুলোতে বল্ল।

"তার মানে, শ্রীমান্ কান্তিকুমার মিত্র, তুমি একটা মিথ্যুক।" এই বলে' থরহরি আবার নিজের কুশনে বসে পড়লেন।

কান্তিও বস্‌ল—নিজের কুশনটা একটু সরিয়ে নিয়ে এবার। থরহরির চড়টা তখনো গালে জ্বল্‌ছিল।

"কেবল মিথ্যুক নও, তুমি আস্ত একটা ধাপ্পাবাজ। কিন্তু কোথায় এসে চালাকি করছিলে তা টের পাও নি। পীরের কাছে মামদোবাজি চলে না। তুমি যে আসলে কে, তা গোড়া থেকেই আমার জানা ছিল—তোমার এই গোয়েন্দাগিরির প্রহসন সুরু হবার সময় থেকেই। তুমি জানো না কিন্তু জেনে

রাখ যে তোমার প্রত্যেকটি পদক্ষেপের ওপর লক্ষ্য রাখা হয়েছিল, কোথায় তুমি যাও, কি করো না করো—তোমার সমস্ত চাল-চলনের ওপরে পুলিসের কড়া নজর ছিল। কান্তিকুমার মিত্র আসলে যে কালু সেন ছাড়া আর কেউ নয়, তা আমাদের অজানা ছিল না। তিন বছর আগে কালু সেন কৃত্তিবাস সেনের গৃহত্যাগ করেছে, আর অজ্ঞাত-কুলশীল কান্তি মিত্রেরও ঠিক তিন বছর আগেই সাংবাদিকরূপে অভ্যুদয়। অতএব কান্তি মিত্র ওরফে কালু সেন, আমার বন্ধু নিহত কৃত্তিবাস সেনের হত্যার জন্য তোমাকেই আমি দায়ী করি। তবে তোমাকে পুলিসের হাতে দেয়া না দেয়া আমার ইচ্ছাধীন। আমার নিজের হাতেই তোমাকে আমি শেষ করতে পারি।" একটানা এত বড় একটা বক্তৃতার পর—তাঁর জীবনে এত অধিক বাক্যব্যয়ের বাহুল্যতা এই প্রথম—থরহরি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তাঁর নিজের হাতে কান্তি মিত্র ওরফে কালু সেনকে আরেকবার শেষ করার বাসনা প্রবল হলেও তেমন কোনো উদ্যম দেখা যায় না।

এবার কান্তি মিত্র কুশন ছেড়ে উঠে এসে তাঁর নাকে এক ঘুষি লাগায়।

"মিথ্যাবাদী !" চেঁচিয়ে ওঠে কান্তিঃ "আমি কালু সেন নই। কক্ষণো না !"

ঠিক এই মুহূর্ত্তে থরহরির জনৈক ভৃত্য দরজা ফাঁক করে' প্রবেশ করে।

"একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, কর্ত্তা।" সে জানায়।

কান্তি মিত্র কুশন ছেড়ে উঠে তাঁর নাকে এক……।

"কে !" থরহরি জিজ্ঞেস করেন। নাকের শুশ্রূষা থামিয়ে।

"আমি চিনি না, তবে তাঁর এই কার্ড্ দিয়েছেন।"

থরহরি দত্ত কার্ডটি হাতে নিলেন। কার্ডের ওপরে স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রিত :—কালু সেন।

কার্ডদৃষ্টে থরহরি এবং কান্তি দুজনে দুজনের দিকে তাকালো —দুটি জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো। কস্ত্বং ? তাহলে—তাহলে কে তুমি – এই যেন প্রশ্ন।

একটু আগে যেখানে তত্ত্বমসির লড়াই চলেছে, তুমিই সেই —সে ছাড়া আর কেউ না—এহেন উচ্চ দার্শনিকতা দেখা গেছে, কার্ডের পৃষ্ঠে দেগে দেয়া 'কালু সেন' এই দুটি কথায় তা যেন আলোর উদয়ে মসীর তত্ত্বের মত তুচ্ছ হয়ে গেল। সোহংএর আবির্ভাবে তছনছ্ হয়ে গেল সব।

লোকটাকে উপরে নিয়ে এস।" বল্লেন থরহরি।

মিনিট্ দুই পরে লোকটা এল। কান্তির শ্যেন চক্ষু কালু সেনকে নিক্ষণ করতে লাগল। তার সবুজরঙা পোষাক, রোদ-চটা তামাটে মুখ. আর লম্বা লম্বা আঙুল দেখলে লোকটা কি কাজ করে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। জাহাজের খালাসী বলে' সহজেই চেনা যায়।

"বোসো।" বল্লেন থরহরি।

"ধন্যবাদ।" বল্ল সেই খালাসী : "বসতে পারলে বাঁচি। আর কিছু না, আমার কাঠের পা-টা একটু স্বস্তি পায় তাহলে।"

থরহরি আর কান্তি আবার পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় করলো। লোকটার একটা পা কাঠের দেখে বিস্ময়ে কান্তি কাঠ হয়ে গেল, আরো দেখল, যা-তা কাঠ নয়, চন্দন কাঠ। লোকটা (দয়া করে' বা চটে গিয়ে) কারো গায়ে যদি পা ঘষে দেয় তাহলে সে পদাহত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ গন্ধে ভুর ভুর করবে। এটা কেবল কাঠের সত্য নয়, কঠোর সত্য।

"আমি এডেন থেকে আসছি।" উপবিষ্ট হয়ে কালু জানাল।

ঘাড় নাড়ল কান্তি। "এখন দেখতে পাচ্ছি।" বল্ল সে ঃ "থরহরি—থরহরিবাবু, আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা ভুল। মূলতঃ যে এটা এডেনাগত কাঠের এক-পা-ওয়ালা একজন লোকের কাজ আগেই তা আমাদের ঠাওর হওয়া উচিত ছিল। সে ছাড়া আর কারো কীর্ত্তি নয়। এ ছাড়া অন্য কাউকে ঠাওর করতে যাওয়াই আমাদের অন্যায় হয়েছিল।"

"সমবেত ভদ্রমণ্ডলী—" কাঠের পা টাকে আরামে রেখে নড়ে চড়ে বসে কালু আরম্ভ করে ঃ—

"আমি আমার জবাবদিহি দিতে এসেছি। আমার স্বীকারোক্তি শুনুন্। যদিও সাধারণতঃ পুলিসের শিকার হবার পরই এই উক্তি করাটা দস্তুর—কিন্তু তার আর সময় নেই। আমি নিজেই আমার শিকার—দুর্ভাগ্যের শিকার। যতদূর মনে হয়, আমার আর বেশি সময় নেই। এখানকার—ঠিক ইহলোকের কি না জানি না— তবে এখানকার খাঁচা থেকে এখনই আমাকে উড়তে হবে।...যতক্ষণ সময় আছে আমার শেষ কথাটা শেষ করে নিই।"

"সে কি !" কান্তি সবিস্মিত হয়ে ওঠে: "তুমি কি অন্তিমক্ষণে এসে উপস্থিত হয়েছ ? শেষ মুহূর্ত্তে এসে দেখা দিয়েছ আমাদের ?"

"তাই কি স্বাভাবিক নয় ? সেইটাই ঘটে না কি সচরাচর ?" পাল্টা প্রশ্ন এল কালুর দিক থেকে। "আপনারাই বলুন।"

"হ্যাঁ, তাই ঘটে থাকে বটে।" কান্তি ঘাড় নাড়ল: "তাহলে নিশ্চয়, তোমার বক্তব্যের মাঝে মাঝে গলার ঘড়ঘড়ানি উঠে তোমাকে বাধা দেবে বোধ হচ্ছে ? হয়তো বেদম কাশিও আসতে পারে—তাই না ?

"আপনি সর্ব্বজ্ঞ। আপনাকে নমস্কার !" কালু সেন পা তুলবার চেষ্টা করল, পারল না। অগত্যা কেবল হাত তুলেই নমস্কার জানাল। "ঠিকই ধরেছেন আপনি।...তবে গলার ঘড়ঘড়ানিটা আমি উপসংহারের জন্যে রেখেছি। বেদম্ কাশিটা মাঝে মাঝে আম্‌দানি করব বটে, তবে তার দেরি আছে।"

"গাল বেয়ে রক্তও গড়িয়ে পড়তে পারে ? য়্যাঁ ?" থরহরির আশঙ্কা হয়—তক্‌তকে মেজের দিকে তাকিয়ে।

"আজ্ঞে না, অতোদূর গড়াবে না।" জবাব দিল কালু: "এবার তাহলে আত্ম-জীবনী সুরু করা যাক্। বাল্যকালের থেকেই আরম্ভ করি—কেমন ?"

"না না, দোহাই, তা কোরো না।" কান্তি এবং থরহরি সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে। এমন কি এতদিনের ও এত কাণ্ডের অকম্পিত থরহরিকে থরথর কাঁপতে দেখা যায়।

কালু সেন ভ্রূকুঞ্চিত করে। "আমার ধারণা, আমার আত্মজীবনী শোনাবার ন্যায্য অধিকার আমার আছে।" সে বলে। "যে লোকটা একজন লোকের প্রাণ নিয়েছে এবং অপর একজনের—মানে, নিজের—প্রাণ দিতে চলেছে—প্রাণের আদান-প্রদান যার কাছে এমন অকাতর এবং তুচ্ছ—তার যা খুসি সবাইকে শুনিয়ে দেবার অধিকার আছে বই কি। এটা বার্থ-রাইট্ না হতে পারে, কিন্তু ডেথ্-রাইট্ যে তাতে সন্দেহ কি? অতএব আমার কাহিনী আপনাদের শুনতে হবে। শুনতেই হবে—না শুনে উপায় নেই।"

ভেঁপোর কিস্তি

কালুর কালোয়াতি

"ছোটবেলা থেকেই আমার দুর্দ্দান্ত স্বভাব।" কালু বল্‌তে থাকে : "যখনই যা মনে হয়েছে তাই করেছি। তখন তখনই যদি কেউ আমাকে শাসন করত—আমার স্বভাব শোধরাবার চেষ্টা করত তাহলে বোধ হয়—"

"কিন্তু তা করা হয় নি।" থরহরি বাধা ছ্যান্ : "তারপর ?"

"আমার কাকার তিন কূলে একা আমিই ছিলাম। আর কাকার ছিল অগাধ ঐশ্বর্য্য। অপর্য্যাপ্ত বিলাসের মধ্যে ছোটবেলা থেকে বর্দ্ধিত হয়ে, কোনোদিন যে আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে বা তার প্রয়োজন হবে, তা বোধ করিনি।—

"ভালো কথা," কান্তি সব কিছুই চুলচেরা খতিয়ে দেখার পক্ষপাতী, বাধা দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করে : "তখন তোমার কটা পা ? পায়ের সংখ্যা কত ছিল ?"

"দুই। মাত্র দুই। ভগবদ্দত্ত সবার যেমন থাকে। কিন্তু অল্পদিনেই বিলাস-ব্যসনের চূড়ান্তে উঠ্‌তে গিয়ে—"

"তোমার পা ফস্‌কালো। মানে একটা পা।" থরহরির পাদটীকা : "কালুভায়া, চট্‌পট্ তোমার আসল কথায় এসে পড়ো। আমার খিদে পেয়েছে।"

"এই এলাম।" বল্ল কালু: "দেরি নেই। কিন্তু মহাশয়রা যতদূর মনে করেছেন ততটা না। খারাপ আমি ছিলাম বটে, কিন্তু একেবারে খারাপ ছিলাম না।"

"না না। তা তো নয়ই।" থরহরি এবং কান্তি সান্ত্বনার ছলে সায় দিল: "তা কে বলছে? পরের টাকা এবং দুশ্চরিত্র সকলেই বেশি বেশি ছাখে কিন্তু তাহলেও শতকরা নিরনব্বই জনের চেয়ে বেশি খারাপ কক্ষণই তুমি ছিলে না।"

"এমন কি আমার জীবনেও ভালোবাসা দেখা দিয়েছিল। যেমন প্রত্যেকের জীবনেই দেখা দেয়। কিন্তু প্রত্যেকের জীবনে ভালোবাসা এলেও ঠিক তেমনটি আসে কি না সন্দেহ আছে। তেমনটি আমি কখনো দেখি নি। এডেনেও না, এমন কি, বসোরাতেও নয়। তাকে দেখলে মনে হয় যেন মূর্ত্তিমতি করুণা। সেই কাশির মহিষি করুণার মত। সে যেমন গরীবদের কুটীরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল ইনিও তেমনি এই গরীবের মনে—বেশি আর কি বল্ব? যেন রবীন্দ্র নাথের সেই 'আনন্দময়ী মুরতি তোমার কোন্ দেব তুমি আনিলে দিবা?' তিন বছর আগে সেই করুণা আমার কাকার বাড়ীতে এল—"

"জানি, জানি। টাইপিস্ট রূপে।...তারপর?" কান্তি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।

"তারপর আমি—আমি তাকে না ভালোবেসে পারলুম না। প্রথমে বোনের মত—তারপর বন্ধুর মত—তারপর—"

"তারপর যৎপরোনাস্তি—ঠিক যেমন হয়ে থাকে। তারপরে

তারপরের মোদ্দা কথাটা আমরা শুনতে চাই।" থরহরি বল্লেন। "যদি বলতে চাও তো বলো।"

"তারপরে একদিন তাকে নিয়ে আমি সিনেমায় গেলাম। আমার কাকা, কি করে' জানি না, সেটা টের পেলেন। সিনেমার ওপরে তিনি হাড়ে চটা ছিলেন। সিন্ আর সিনেমা তাঁর ধারণায় ছিল এক জিনিষ, এমন কি সইস্ কোচম্যান্দেরও তিনি সিনেমা দেখার ছুটি দিতেন না—পাছে তারা ঘোড়াদের বখিয়ে দেয়—"

"ঘোড়ার কথা থাক্," কান্তি বল্ল: "তোমার কথা বলো। কাকা ঐ কাণ্ড টের পাবার পর কি হোলো তাই শুনি?"

"ভারী তিনি চটে গেলেন। এমন কি ঐ নিয়ে আমাদের মধ্যে ভীষণ কলহ পর্য্যন্ত হয়ে গেল। শেষে তিনি আমাকে ত্যজ্যপুত্র করে' দিলেন।—"

"ত্যজ্য ভ্রাতুষ্পুত্র। তাই নাকি।" কান্তি ভ্রমসংশোধন করে।

"ত্যজ্য ভ্রাতুষ্পুত্র করে' তাঁর অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করে' ঘাড় ধরে' তাঁর বাড়ী থেকে আমাকে তিনি বার করে' দিলেন। তাড়িয়ে দিলেন আমায়।"

কালু থাম্ল, এইবার সেই পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত কাশির ধমকটা দেখা দেবে বলে' কান্তি মিত্রের মনে হয়। থরহরি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে তাঁর সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। বোধ হয় এই তাঁর জীবনের প্রথম দীর্ঘনিশ্বাস। নিজের জন্য যা কখনই তাঁকে ফেল্তে হয়নি, কোনো কারণ ঘটেনি ফেলবার, অন্যের

গৃহ-বিতাড়িত হবার দুঃখে অনেক দিনের জমানো সেই দীর্ঘনিশ্বাস এই সুযোগে তিনি পরিত্যাগ করেন।

কালু সেনও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আরম্ভ করে আবার।

"ছোটবেলায় আমার আরেক ভালোবাসা ছিল। শিশুর থেকে আমি সমুদ্রকে ভালোবাসতে শিখেছিলাম।"

"কোন্ শিশুর থেকে?" কান্তির সাগ্রহ প্রশ্ন।

"সমুদ্রের প্রতি টান আমার ছোটবেলার। নৌকো দেখলে তার পালের আগে আগে আমি ছুটতাম।"

"নৌকোর পাল?" কান্তি আরো অবাক্ হয় এবার। "তোমার সামুদ্রিক পরিভাষা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। নৌকোর পাল আবার কি? নৌকোরাও কি গোরুর মতন পালে পালে চরে নাকি? আর চরলেও, তাদের আগে আগে না ছুটে পিছনে পিছনে দৌড়নোর বাধা ছিল কি?"

কালু সেন কান্তির কোনো জবাব দিতে পারে না। কাশ্তে আরম্ভ করে। জবাব দিতে পারে না বলেই কাশিবাস সুরু করে বোধ হয়।

চৌদ্দর কিস্তি

কার্য্য এবং কারণ বনাম কারণ এবং কার্য্য

কাশির অনর্গলতা কম্‌লে কালু জানায়ঃ "সব পালাটা শুনুন্ আগে আমার। তারপর বল্‌বেন। কাকা আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে আমার সেই বাল্যকালের ভালোবাসা মনে পড়ল। সমুদ্রকে আমি সত্যিই ভালোবাসতাম। শিশু পাঠ্য বই পড়ে যে ভালোবাসা জন্মেছিল, সিনেমায় সমুদ্রের ছবি দেখে জমে জমে তা বেড়ে উঠেছিল অনেকখানি। একটা জাহাজে খালাসীর কাজ নিয়ে যেদিকে দু চোখ যায় আমি বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে গেলাম যবদ্বীপের দিকে। সেখানে মলয় উপকূলে এক সামুদ্রিক ডাকাত আমার একটা পা ছিঁড়ে নিল। ভাগ্যিস্, মলয় বনে চন্দন সস্তা, তাই আসল পায়ের চেয়েও দামী, চন্দন কাঠের এই মূল্যবান পদ আমি লাভ করেছি।—"

"তুমি তো মরতেই যাচ্ছ। যখন তোমার অন্তিমক্ষণ এসেছে তখন শেষ পর্য্যন্ত তোমাকে মরতেই হবে। যদি কিছু না মনে করো তাহলে স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ তোমার পা থেকে একটুখানি আমি কেটে নিতে চাই। আমার এক পিসীর ভারী পূজো-আর্চ্চার বাতিক, তিনি পেলে খুব খুসী হবেন। কেটে নিলে তোমার লাগবে না তো?" কান্তি জিজ্ঞেস করে।

"পায়ে লাগবে কিনা জানি না। তবে মনে লাগবে। কত কষ্ট করে' এই পা বানানো।" কালু জানায়।

"তবে থাক্, থাক্। দরকার নেই।"

"এইবার আমি সেদিনের ঘটনায় আস্‌ব। কিছুদিন আগেকার সেই ঘটনায়। আমার কাহিনীকে আর অযথা বাড়াতে চাই না। হরহরিবাবুর বোধ হয় খাবার সময় হয়েছে, খিদেয় ছট্‌ফট্ করছেন মনে হচ্ছে। এবার এক কথায় সেরে ফেল্‌ব। জাপানী আক্রমণ স্থুরু হইতেই—তিন বছর আগের কথা বলছি—আমরা মলয় থেকে পাত্তাড়ি গুটিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে রওনা দিলাম। তারপর এই আড়াই বছর ধরে নানা দেশের নানান্ উপকূলে ভিড়ে নানাবিধ জীবনযাত্রা দেখে অবশেষে একদিন এডেন্ হয়ে আমাদের জাহাজ করাচীর বন্দরে এসে পৌছল।"

"আমরা জানতাম।" বল্ল কান্তি।

"আপনাদের অজানা কি আছে? গোয়েন্দারা কী না জানেন? তারপর যা বল্‌ছিলাম। করাচীতে জাহাজ এলে আমি কিছু দিনের ছুটি নিলাম। ছুটি নিয়ে রেলে চেপে এসে পৌছিলাম কল্‌কাতায়।...

"আসবার পথে কি তুমি কাশি হয়ে এসেছিলে নাকি?" কান্তি বাধা দিয়ে প্রশ্ন করে।

"কাশি? না তো। কাশি হয়ে আসিনি—এসেই কাশি হোলো। এই মারাত্মক কাশিটা।...তারপর যা বল্‌ছিলুম।...

কথা ছিল, করাচী থেকে আমাদের জাহাজ কল্‌কাতার

ডকে যেমন এসে পৌঁছবে, তেম্নি আমারো ছুটি ফুরোবে। আমি এখান থেকেই জাহাজে আমার কাজে যোগ দেব। আমি দেখলাম, এই সুযোগ।—”

“খুড়োর গঙ্গাযাত্রা করবার। তাই না?” কান্তিও যোগ দেয়।

“ঠিক ধরেচেন।...কল্‌কাতায় আমার ভূতপূর্ব্ব বাড়ীতে ফিরলাম বটে, কিন্তু কী গেছ্‌লাম আর কী এলাম! তিক্ত মন, আশাহীন জীবন, দেহের ভগ্নাবশেষ নিয়ে এ কী ফিরে আসা! কেবল একমাত্র এই চিন্তা তখন আমার মনে ছিল—আমার এই সর্ব্বনাশের জন্য যিনি দায়ী আমার সেই কাকাকে এবার নিকেশ করে' যাব।”

আবার দ্বিতীয়বার কাশিটা এসে ধমক্ দিতে লাগল কালুকে। কাশতে কাশতে অস্থির হয়ে পড়ল বেচারা। থরহরি আর কান্তি উভয়ে উভয়ের দিকে কটাক্ষ করলেন। যার মর্ম্ম হচ্চে, লোকটা কি শেষ কথা বলার আগেই বলা শেষ করবে? খক্‌খকানি যে আর থামে না!

পনেরোর কিস্তি

কাশির উপসংহার

কাশির ধমকানি শেষ হলে কালু সেনের সুরু হোলো :

"সন্ধ্যের পরে অন্ধকার বেশ জমাট হয়ে এলে আমি কাকার বাড়ীর মাটিতে পা দিলাম। রাত তখনো বেশি হয়নি, কিন্তু কাকার প্রিয় ভৃত্য উদ্ধবের টিকি দেখা গেলনা। তাতেই বুঝলাম কাকা বেরিয়েছেন। কাকা বাড়ীর বাহির হলেই উদ্ধবের পাড়া-বেড়ানো আরম্ভ হয়। কাকা বাড়ীর গাড়ীতে বেরোননি বোঝা গেল, কেননা গাড়ী ঘোড়ারা আস্তাবলেই ছিল, কিন্তু তারা থাকলেও সহিস কোচ্‌ম্যানরা ছিল না। একটা ঘোড়া আমাকে দেখে চিন্‌তে পারল কি না জানি না, কিন্তু হ্রেষারবে সেই আমাকে প্রথম অভ্যর্থনা জানাল।

"সদর দরজা খোলাই পড়েছিল, ইচ্ছে করলে স্বচ্ছন্দে সেই পথেই বাড়ীতে ঢুক্‌তে পারতাম। কিন্তু যে খুন্‌ করতে এসেছে তার ওভাবে গৃহ-প্রবেশের কোনো মানে হয় না। ঝোপ ঝাড়ের আড়াল থেকে কাজ সারাই তার উপাদেয় বলে মনে হয়। কিন্তু কাকার বাগানবাড়ী নামেই বাগানবাড়ী, বাগান সেখানে নামমাত্র, ঝোপঝাড়ের অস্তিত্বই নেই। কিন্তু যেখানে ঝোপঝাড় নেই, আর যখন সদর দরজা খোলা, এবং কেউ নেই কোথ্‌থাও, তখন কি করি? অগত্যা আমার

কাঠের পায়ের সাহায্যে বাধ্য হয়ে আমাকে দেয়াল বেয়ে উঠ্‌তে হোলো। অসাধারণ সাহসে ভর করে' তাই উঠ্‌লাম। তাছাড়া পথ ছিল না। দোতলা পর্য্যন্ত উঠে একটা জানালা পাওয়া গেল। কাকার বিলিয়ার্ড ঘরের জানালা। জানালার কার্নিশে বসে' অসাধারণ কৌশলে তার ভেতরের খিল্‌টা খুল্‌লাম। কৌশলটা আর কিছু না, ছুরি দিয়ে খড়খড়ি ফুঁক্ করে' হাত গলিয়ে ভেতরের ছিট্‌কিনিটা খুলে ফেলা। ইচ্ছে করলে সদর দরজা দিয়ে অনেক আগে বিলিয়ার্ড ঘরে পৌঁছে ভেতর থেকেই জানালাটা খুল্‌তে পারতাম—ঢের সহজেই। কিন্তু কার্নিশে বসে খোলাটাই অসাধারণ। অন্য ভাবেও খোলা যেতো বটে, কিন্তু কাজটা খেলো হয়ে যেত। পরদিন সকালে পুলিসের লোকরা এসে কিসের এত অনুসন্ধান করত তাহলে? ক্লু খুঁজ্‌ত কোথায়? অনুসন্ধান করবার মত কিছু না পেলে তারা বিরক্ত হত নাকি? ভাবত যে আমি তাদের হতাশ করেছি, তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করিনি, আমার উপযুক্ত কাজ আমি করিনি। মনে মনে তারা টিট্‌কিরি দিত আমাকে। এই সব দিকে দৃষ্টি রাখা দায়িত্ব-জ্ঞানী হত্যাকারীর কর্ত্তব্য। ভালোবাসার পথ যেমন অত্যন্ত সোজা, সহজেই যাওয়া যায়, কিন্তু ইচ্ছে করে' আমরা তাকে ঘোরালো করে তুলি, তেম্‌নি খুনখারাপির পথও। তার মধ্যে ঘোর প্যাঁচ না থাক্‌লে কিছুই থাক্‌ল না। কোনো মার্ প্যাঁচ্ না করে' যদি মার্‌া যায়, মারলেও সেটা মারা হোলো না। খুনের অভিধানে সেটা অপকর্ম্ম।—"

কান্তি হাঁ করে' কালুর মুখ থেকে এই হত্যা-তত্ত্ব শুনছিল—থরহরি তাদের দুজনকেই বাধা দিলেন। "ঢের হয়েছে। এখন আসল কথা শুনি।" তিনি বল্লেন। এইবার নিয়ে তিন বার।

রান্নাঘর থেকে ইলিশমাছ ভাজার গন্ধ এসে অনেক্ষণ থেকে তাঁকে বিচলিত করছিল। না বলে' তিনি থাক্‌তে পারলেন না।

"জানলা খুলে ফেলে তারপরে আমি বিলিয়ার্ডের ঘরে পা নামালাম। খুনের নেশায় বুকের রক্ত তখন টগ্‌বগ্‌ করছে আমার। কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ, তিনি আমাকে খুব বাঁচিয়েছেন। খুন্ আমাকে করতে হয়নি—"

"য়্যাঁ, এই যে বল্লে তুমিই করেছ? এখন আবার—?" কান্তি চেঁচিয়ে ওঠে।

"এখনো আমি কিছুই বলিনি। করেছি কি করিনি, আমার কাহিনী শেষ হলে আপনারাই তার বিচার করবেন। করেছি কি করিনি আমি নিজেও জানি না। আমি নিজেও তা জানতে চাই। আপনাদের কাছ থেকেই জানতে চাই। আপনারাই তার বিচারক।"

"আহা, বল্‌তেই দাও না ওকে। তুমি আবার কেন বাধা দিচ্ছ?" বাধা দিয়ে থরহরি স্বয়ং এবার বলেন। বলেন কান্তিকেই।

"হ্যাঁ, যেম্‌নি না আমি বিলিয়ার্ডের ঘরে পা দিয়েছি—তক্ষুনি সেই ঘরের বিজ্‌লি বাতি জ্বলে উঠ্‌ল আর আমার চোখের সাম্‌নে দেখতে পেলাম—না, কাকে দেখতে পেলাম

তা আমি বল্‌বনা—তা আপনারা আমাকে খুন্‌ই করুন্ আর যাই করুন—সেই দেবীর বর্ণনা আমার এই পাপ মুখে আমি করবনা। সেই দেবী বল্লেন—দেবীদের অজানা কী আছে? সকলের নাড়ির খবর তাঁদের হাঁড়িতে—দেবী বল্লেন আমায়—'পিল্‌টু!—' আদর করে' ঐ ডাক নাম তিনি দিয়েছিলেন আমাকে—বল্লেন আমায়—"পিল্‌টু, বুঝতে পেরেছি। তোমার কাকাকে তুমি খুন্ করতে এসেছ। ও কাজ কোরো না।' দেবীর ঐ কথায় আমার মন ঘুরে গেল, কেমন ঘুরে গেল। মত বদ্‌লে গেল আমার। আমি হাউ হাউ করে' কাঁদ্‌তেলাগ্‌লাম, ঠিক যেমন করে—যেমন করে—"

ভাষায় কুলিয়ে উঠ্‌তে না পেরে কালু সেনকে থামতে হয়। থরহরি দাড়ি চুল্‌কান।

"ঠিক যেমন করে' হাবারা কাঁদে।" কান্তি বাৎলে দেয়। "তারপর বলে' যাও।"

"কান্নাকাটি শেষ হলে, নীচে থেকে কাকার গলার আওয়াজ এল। 'চট্‌পট্—' বল্লেন সেই দেবী 'চট্ করে' কোথাও লুকিয়ে পড়ো। উনি যেন তোমায় না দেখতে পান্।" এই বলে' দেবী পাশের একটা ঘরে পালিয়ে গেলেন। আমি চার ধারে তাকিয়ে কেবল একটা তাক দেখতে পেলাম। বেশ বড়ো-সড়ো তাক্—পর্দ্দা দিয়ে ঢাকা। পর্দ্দার আড়ালে কোনো রকমে তার মধ্যে গুড়িসুঁড়ি মেরে লুকিয়ে থাকা যায়। আমি সেই তাকে গিয়ে উঠ্‌লাম। কি করে' উঠ্‌লাম বল্‌ব?"

"না। নিজেই আমি মাথা ঘামিয়ে বার করতে পারব।"

কান্তি জবাব দিলঃ "যদ্দূর মনে হয়, তোমার ঐ কেঠো পা দিয়ে এক লাফে গিয়ে উঠে দাঁড়ালে ?—অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সাহায্যেই ?—তাই না ?"

কালু সেন জবাব দিল পা নেড়ে—সেই কেঠো পা খানাকেই নেড়ে চেড়ে জানাল যে তাই বটে।

ঘোলোর কিস্তি

রহস্যভেদ

"পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম কি হয়। কাকা এলেন, থরহরিবাবু এলেন। কাকা বল্লেন, এসো থরহরি, একদান্ খেলা যাক্।

থরহরিবাবু জানালেন যে তাঁর আপত্তি নেই। এক পেট খাওয়ার পর বিলিয়ার্ড খেলায় নাকি হজমের সাহায্য করে। এই নাকি তাঁর ধারণা।

তারপর দুজনের খেলা সুরু হোলো।

আমি ওঁদের খেলা লক্ষ্য করতে লাগলাম। পর্দ্দায় একটা ছ্যাঁদা ছিল। তার ভেতর দিয়ে নিজে অদৃশ্য থেকেও সমস্ত কিছু দিব্যি দেখা যায়,—"

কান্তি বল্ল—"হ্যাঁ, পর্দ্দার ছ্যাঁদাটা আমি দেখেছিলাম

বটে। যদিও ছ্যাঁদার ভেতর দিয়ে কতদূর দেখা যায় না যায় লক্ষ্য করতে যাইনি।"

"এই তো গোয়েন্দাদের গলদ্। আসল লক্ষ্য ফেলে উপলক্ষ্যের পেছনে আপনারা ছোটেন। যাই হোক্, দেখতে লাগলাম খেলাটা—কিন্তু খেলা আর শেষ হতে চায় না। এদিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার পা টন্‌টন্ করতে লেগেছে। খেলতে খেলতে দুজনেই খুব মেতে উঠলেন—এবং দেখতে দেখতে তেতে উঠলেন দুজনেই। অবশেষে ঐ খেলা নিয়ে ঝগড়া বেধে গেল দুজনের। থরহরিবাবু হেরে গেছলেন। কালু ফাঁস করে' দিল।"

থরহরি বাবু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলেন; "সে যে সাদা বলটাকে—" তার বেশি তিনি আর বলতে পারলেন না। এতদিন পরেও সেই কথা ভাবতে গিয়ে ভাবাবেগে তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল।

"ঠিক কথাই।" বল্ল কালু: "আমার কাকা লাল বলটা মারতে পারেননি। তার ফস্‌কে গেছল। কান্তিবাবু, সমস্ত বিলিয়াডের গবেষণাই তোমার ভুল। আগাগোড়াই গলতি। বিলিয়ার্ড খেলায় কেউ শেষ পয়েন্ট নিয়ে ব্যস্ত হয় না। তখনো টেবিলে দুজনেরই নিরনব্বই। থরহরিবাবু টেবিল ছেড়ে চলে গেছেন। আমার কাকা তারপরও লাল বল্‌টাকে বারবার তাক্ করতে লাগলেন। একলা একলা সব বিলিয়ার্ড খেলোয়াড়ই যা করে। আধখানা মারে বল্‌টাকে টপকে নিয়ে গিয়ে টেবিলের পকেটস্থ করা —এই চেষ্টাই তিনি করতে

লাগলেন বারম্বার। কিন্তু কিছুতেই পারছিলেন না। কতো রকমভাবে তিনি করলেন। কিন্তু কিছুতেই বল্‌টাকে কাবু করতে পারলেন না।”

“এই চেষ্টায় ক্রমশঃ তিনি দুর্ব্বল হয়ে পড়লেন বোধ হয়?’ কান্তি জিজ্ঞেস করল। খুঁটিনাটির দিকে তার খর নজর।

“মোটেই না।···অবশেষে তিনি করলেন কি···আমি সেই পর্দ্দার ছিদ্র ভেদ করে’ দেখতে লাগলাম—অদ্ভুত এক কাণ্ড করলেন। পকেট থেকে রুমাল বার করে’ গলায় জড়ালেন, ফাঁসের মত করে’ জড়ালেন, আর সেই ফাঁসের মধ্যে বিলিয়ার্ডের কিউটাকে রাখলেন। ‘এইবার বোধ হয় আমি পারব।’ তিনি বল্লেন এইবার।”

“হ্যাঁ, এবার আমি বুঝতে পারছি।” বল্ল কান্তি।

“হ্যাঁ, এবার পারবেন।” কালু বল্ল: “গলায় কিউ বেঁধে বল্‌টার পশ্চাতে এবার তিনি লাগলেন। খুব উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত্ত, বুঝতেই পারছেন। খেলা দেখতে দেখতে আমিও খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। কোথায় আছি, কি অবস্থায় আছি, কিছুই আমার মনে ছিল না। কাকার মারটা দেখবার জন্য পর্দ্দা ফাঁক করে’ ঝুঁকে পড়ে দেখতে গেছি—আমার কাকা তাক্ করছেন আর আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে—দুজনের এই তাকাবার মুহূর্ত্তে তাক্ থেকে আমার পা ফসকে গেল! কাকা ছিলেন ঠিক আমার সামনেই, আমি তাঁর ঘাড়ে গিয়ে পড়লাম। কাকাও পড়ে গেলেন। আমাকে নিয়ে তিনি পড়লেন। পড়লেন মেজেয়।”

"এখন দেখা যাচ্ছে।" বল্ল কান্তি: "উপুড় হয়ে তিনি পড়লেন আর তাঁর মাথা ঠুকে গেল মেজেয়। আর গলার ফাঁসে আর কিউয়ে আটকে গিয়ে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর মৃত্যু ঘট্‌ল। বিলিয়ার্ডের লাঠি আর রুমালের ফাঁস— এরাই তাঁর মৃত্যুর কারণ। এখন বুঝতে পারছি।"

"হুবহু তাই।" কালু জানাল। "তারপর যখন আমি এই দৃশ্য দেখলাম, দেখলাম যে তিনি অক্কা পেয়েছেন, আর এক দণ্ডও সেখানে দাঁড়াবার আমার সাহস হোলো না। কিউটাকে ছাড়িয়ে এনে কাকার গলার ফাঁসটা আরো ভালো ভাবে আমি এঁটে দিলাম। তাঁর হাত দুটো স্বামী বিবেকানন্দের ষ্টাইলে সাজিয়ে দিলাম। ওই ষ্টাইল্‌টা আমার খুব ভালো লাগে। ওতে বুকে জোর পাওয়া যায়। তারপর যেমন এসেছিলাম তেমনি বেমালুম সেস্থান থেকে আমি প্রস্থান করলাম।"

"তেমনি দেয়াল বেয়ে? না জানালা ডিঙিয়ে?" কান্তি প্রশ্ন করল।

"না, এবার সদর পথেই। খুন্ করলে অবশ্য অন্য পথ নিতো হতো।"

"কিন্তু পিন্ দিয়ে তোমার কাকার বুকের কাছে গাঁথা সেই কাগজ খানা? যাতে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার তোমার নামে উইল করে' দেয়া হয়েছে—সেটার কথাতো কিছু বল্লে না হে?"

"কি কাগজ? কই, আমি তো তার কিছুই জানি না।

তেমন কিছুই তো আমি লিখিনি। সে-সব লেখবার কথা আমার মনেও ছিল না। আমি তখন সেখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি।"

"তুমি না লিখ্‌লে কে আবার তবে লিখ্‌বে? তবে কি আমি লিখেছি?" কান্তি এবার চটে যায়, তার ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না বলেই বোধ হয়!

"তা হলে—তাহলে কি সেই দেবী—সেই দেবীই কি?"—কালু সেন এই পর্য্যন্ত বলেই থেমে যায়।

"তা হতে পারে। দেবীদের অসম্ভব কিছুই নেই।" থরহরি বলেন: "দেবীদের রহস্য দেবতারাও টের পান্ না।"

"তোমার কাকার ঐভাবে মারা যাওয়াটা দৈব-দুর্ঘটনা হতে পারে—কিন্তু ঐ কাগজের লেখাকে আমি দেবী-মাহাত্ম্য বলে' মান্‌তে প্রস্তুত নই।" কান্তি বলে।

"কালু, গল্পটা তুমি বানিয়েছ মন্দ নয়।" কিছুক্ষণ ভাবিত থেকে থরহরিবাবু বলেন: 'এপর্য্যন্ত যত খুনের কেচ্ছা আমার কাগজে বেরিয়েছে, তার সবকটাকে টেক্কা দিয়েছ নিঃসন্দেহ। কিন্তু তবু তোমার গল্পের এক জায়গায় গলদ আছে—একটা কথা কিছুতেই আমি বুঝতে পারছি না। তোমার কাকার গায়ে যে দুটি বুলেটের দাগ দেখা গেছে—তার মানে? গুলির ঐ গর্ত্ত দুটো এল কোথ্‌থেকে?"

"সাবেক কালের গর্ত্ত। বহু পুরণো।" কালু ধীরে ধীরে বলে, "বলতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে, কিন্তু না বলিয়ে আপনারা ছাড়লেন না। বড়লোক হবার আগে আমার কাকা একজন

বড়দরের গুণ্ডা ছিলেন। গ্যাঁড়াতলার গুণ্ডার সর্দ্দার ছিলেন তিনি। সেই সময়ে পুলিসের অনেক গুলি তাঁকে হজম করতে হয়েছে। পুলিসের হাত ছেড়ে পালাতে গিয়ে কতোবার যে তিনি গুলি খেয়েছিলেন তার ইয়ত্তা ছিল না। তাঁর সারা দেহ অমন অনেক গুলিতে ঝাঁঝ্‌রা। বয়েস বেশি হয়ে গেলে আর অত ঝক্কি নেয়া তাঁর পোষাল না। অত ঝক্কি নিয়ে অর্থোপার্জ্জনে শেষ পর্য্যন্ত মজুরি পোষায় না। তার চেয়ে সোজাসুজি আইনসঙ্গত উপায়ে টাকা কামানোর দিকে তাঁর নজর পড়ল। তিনি বল্লেন, কেন, আইন বাঁচিয়ে কি চুরি ডাকাতি করা যায় না? আইনের জোরে কি না হয়? এবং তারপরই তিনি কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হয়ে গেলেন। তিনি বল্‌তেন, গুণ্ডার সর্দ্দারির চেয়ে কর্পোরেশনের সর্দ্দারিতে বেশী লাভ, অথচ প্রায় একই ব্যাপার নাকি, একই ওস্তাদির রকমফের কেবল। এমন কি তিনি আরো বলতেন। যে, চোর শুধুই চোর, গাঁটকাটা কেবলই গাঁটকাটা, গুণ্ডা গুণ্ডাই কেবল, কিন্তু এদের সকলের গুণ একত্র করলে, চুরি জোচ্চুরি বাটপাড়ি এবং গুণ্ডামি এক জায়গায় জড়ো করলে যে বস্তু নিজ গরিমায় দেখা দেয় তাই হচ্চে নাকি কর্পোরেশনের কাউন্সিলার। কর্পোরেশন থেকে লাটের দরবারে এমনকি বড়লাটের খাস কাউন্সিলে যাবার পর্য্যন্ত তাঁর লোভ হয়েছিল। সে সব জায়গার ব্যাপার নাকি আরো বড়দরের, তিনি বলতেন। কিন্তু সে-বাসনা চরিতার্থ করবার তিনি আর সুযোগ পেলেন না। আমার মুহূর্ত্তের পদস্খলনের জন্যই সেই আকাঙ্ক্ষা তাঁর অপূর্ণ থেকে গেল।" কালুসেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল এই বলে'।

কাউন্সিলর কৃত্তিবাস সেনের পূর্ব্ব-পরিচয়

(গাঁড়াতলার মোড়ে পকেট মারিতেছে)

"একেই বলে একের পাপে অন্যের পতন।" কান্তি মিত্রের মন্তব্য শোনা যায়।

কালুসেন নীরব। সকলেই চুপচাপ, কারো মুখে কথাটি নেই।

অবশেষে কালুই স্তব্ধতা ভাঙ্‌ল:

"মশাইরা, আমার সময় খুব কম। (আবার এক কাশির ধাক্কা এসে পড়ল।) আমার মনে হয় আমি ভেঙে পড়ছি, ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে পড়ছি। মৃত্যুমুখেই উপনীত হয়েছি বোধ হয়। থরহরি বাবুর বাড়ীতে মারা পড়ে তাঁকে আবার নতুন আরেক দায়ে জড়াতে আমি চাই না। যেটুকু অল্প সময় এখনো আমার আছে তার মধ্যেই এখান থেকে কোনোরকমে এই মুমূর্ষু দেহকে টেনে হিঁচড়ে আমি চলে যেতে চাই। কিন্তু নির্দোষ এবং কলঙ্ক মুক্ত হয়ে এখান থেকে আমি যেতে পারি কি না সেই কথাই আমি জানতে চাইছি।"

"তুমি নির্দোষ এবং নিরপরাধ।" থরহরি বাবু দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন।

শেষ কিস্তি

কিস্তিমাৎ

কালু সেনের কলঙ্ক মোচনের পর কয়েক দিন কেটেছে। এই ক'দিন ধরে' কান্তি মিত্র কেবলি ভেবেছে কি করবে। মিত্রতার পরিধি আরো বাড়াবে কি না এই ছিল তার প্রশ্ন, অবশেষে আজ সকালে কাঁচির কাপড়ের উপরে সিল্কের পাঞ্জাবী চ'ড়িয়ে, সর্ব্বাঙ্গে অগুরু ছড়িয়ে নিয়ে গুরুতর সমস্যাটার মুখোমুখি হবার মতলবেই সে বেরিয়ে পড়ল। সমস্যাটা দেখতে যখন সুশ্রীই, অন্ততঃ আপাত দর্শনে এমন কিছু অরুচিকর নয়, তখন তার সাম্‌না সাম্‌নি হতে পেছপা হবার কি আছে? প্রয়োজনই বা কি? এই কথাই কান্তি ভাবল।

এবং এই ভেবেই সে অলকা দত্তর দ্বারদেশে গিয়ে উপস্থিত হোলো। কিন্তু তখনো তার ভাবনা তাকে ছাড়ে নি। কড়া নাড়বে কি নাড়বে না? কড়ার আওয়াজ করা উচিত হবে কি? এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তখনো।

কান্তি মিত্র সিঁড়ির ওপর বসে পড়ল—ভাবতে ভাবতে। 'এই যে কাজ করতে যাচ্ছি, এর পরিণামে আমার ভাবী জীবন কি সুখময় হবে?' এই কথা সে জিজ্ঞেস করেছে। পুনঃ পুনঃ, নিজেকেই।

'ভেবে দেখলে আমি কৃত্তিবাসের চেয়ে বেশি হঠকারিতা করতে চলেছি। সে নিজের গলায় বিলিয়ার্ডের কিউ বেঁধে ছিল, আর আমি জল জ্যান্ত একটা মানুষকে আমার গলায় বাঁধতে যাচ্ছি? ভালো করছি কি না জানিনে।' কান্তি চিন্তা করে।

'আস্ত একটা মানুষকে গললগ্ন করে' সংসার সমুদ্রে সাঁতার দেয়া কি আমার পক্ষে সম্ভব হবে? খোদাই জানেন!' এই কথাও ভেবেছে কান্তি।

'নাঃ, আর ভাবব না। কৃত্তিবাস যদি একজনের গলায় ফাঁস লাগাতে পারে—তা হলে আমি কেন তুজনের গলায় লাগাতে পারবে না? সে নিজের গলায় লাগাতে পারল আর আমি পারব না? আমি কি তার চেয়েও ভীতু? তার চেয়ে কি কোনো অংশে কম আমি?'

'না, আমি তেমন কাপুরুষ নই!' অবশেষে এই স্বগতোক্তি করে' কান্তি মিত্র উঠে পড়েছে। সিঁড়ি থেকে উঠে কড়া বাজিয়েছে দরজার!

দরজা খুলে যেতেই জিজ্ঞেস করেছে: "অলকা দেবী আছেন?"

একটি আধাবয়সী মেয়ে বেরিয়ে এসেছে। অলকা কালকে এখান থেকে চলে গেছে।"

"চলে গেছেন? কোথায়?"

কান্তি মিত্রর মনে হয় আবার সে সিঁড়ির ওপর বসে পড়েছে। নিজেকে ধরাশায়ী বলে' তার—ধারণা হয়।

"তা তো বল্‌তে পারব না।" উত্তর এসেছে মেয়েটির কাছ থেকে।

"আপনি কে? আপনি কি এখানকার—?" কান্ত জিজ্ঞেস করে।

আমরা এই বাড়ীর অন্য ভাড়াটে। অলকার সঙ্গে আমার ভাব ছিল। আপনি কি কান্তি বাবু? সেই রকম যেন মনে হচ্ছে। যদি তাই হয় তাহলে আপনার নামে একটা চিঠি আছে। অলকার চিঠি। দাঁড়ান, এনে দিচ্ছি।"

চিঠিটা নিয়ে কান্তি মনে মনেই পড়ল।

"প্রিয় কান্তি বাবু,

পিল্‌টু আর আমি গতকল্য তিন আইন মতে পরস্পরকে বিবাহ করেছি। পিল্‌টুকে চিনতে পারবেন আশা করি। তাঁর ভালো নাম হচ্ছে কালু সেন। আমরা আজ জাহাজে চড়ে এডেনের দিকে যাত্রা করব। আজ সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়চে। এখান থেকে বসোরায় গিয়ে বাসা বাঁধবার বাসনা আছে।

আপনি শুনে সুখী হবেন পিল্‌টুর কাশি এখন অনেকটা কম। চ্যবনপ্রাশ খাওয়াচ্ছি—কল্পতরুর চ্যবনপ্রাশ। কাশির পেয়ারা খেলেও সারত, কিন্তু তা আর পাচ্ছি কোথায়? তবে বোগদাদের আঙুর খেলে সেরে যাবে আশা হয়।

আরো সুখের বিষয়, কৃত্তিবাস সেনের এটর্ণিরা তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকার পিল্‌টুকে দিতে ইতস্ততঃ করেন নি। কেন না যে

কাগজখানা নিহত কৃত্তিবাস সেনের বুকে আঁটা দেখা গেছল সেটা কৃত্রিম নয়। কৃত্তিবাস বাবুরই নিজের হাতের খসড়া— অনেকদিন আগেকার রচনা। খসড়াটা তাঁর কোন্ দেরাজে ছিল আমি জানতাম। আমিই ওটা বার করে এনে তাঁর জামায় এঁটে দিই—তিনি দেহরক্ষা করবার পর। পিলটুর মুখ চেয়েই এ কাজ করেছিলাম, বোধ হয় অন্যায় করিনি।

যাই হোক্, ওই খসড়া আমার মামা শ্বশুরের স্বহস্তলিখিত বলে' এটর্ণিরা সনাক্ত করেছেন। তা ছাড়া ঐ খসড়ার আরেক কাপি রেজেষ্ট্রিকৃত হয়ে, তাঁদের দপ্তরেও ছিল তাও জানা গেছে।

পিল্টু কৃত্তিবাসদত্ত নিজের যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে' বিক্রয়লব্ধ টাকাটা বসোরার ঠিকানায় পাঠাবার ভার এটর্ণিদের দিয়ে যাচ্ছেন। আশা করা যায়, এই কাজের জন্য এটর্ণিরা নিজেদের প্রাপ্য ফিস্ কেটে নিলেও তাঁদের কাছ থেকে ষোলো আনার এক আনা ভাগও, ভাগ্যে থাকলে, কোনো না কোনো সময়ে আমরা পাব। সেই আমাদের যথেষ্ট।

আমাদের দুজনেরই ধারণা, আপনার মত গোয়েন্দা আর হয় না। পিল্টু তো বল্‌ছে, আপনি না থাকলে সে আজ কোথায় দাঁড়াত?

ইতি—আপনার বিশ্বস্ত

অলকা দত্ত।

পুনশ্চঃ—একটা কথা আপনাকে বল্‌তে ভুল হয়েছিল। বিলিয়ার্ড ঘরে যে পিলটুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল সে কথা আপনাকে বলা হয় নি। কিন্তু তা না বল্লেও, এ কথা আমি বারম্বার বলব যে আপনার গোয়েন্দাগিরির তুলনা হয় না।

—ইতি—